ANU SAREES®

ANUSHREE TEXTILES PVT. LTD.

14, Amratalla Street, 2nd Floor, Kolkata - 700 001 (W.B.)
Phone : 033-22351257, E-mail : anusaree@gmail.com

With Best Compliments from -

SPORTSLINE

Certified Substantial Sports Protection
Made in India
H-29, Udyog Nagar Industrial Area, Near Peeragarhi
New Delhi - 110041, India
+91-11-25470502, +91-11-49052142
sportslineindia@gmail.com
www.sportshelmet.com

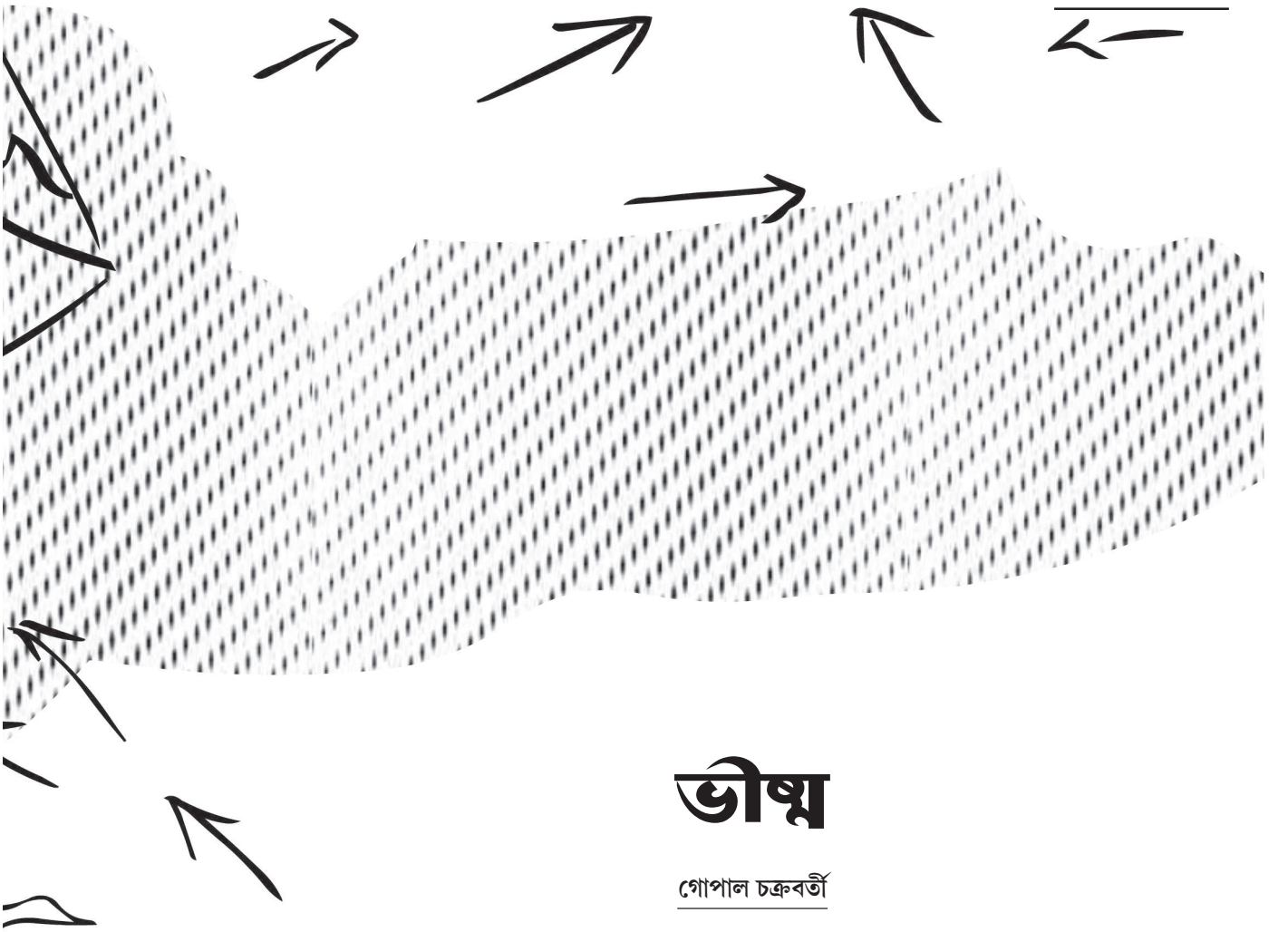

ভীষ্ম

গোপাল চক্রবর্তী

সূর্যবংশীয় রাজা ইক্ষ্বাকুর পুত্র মহাভিষ। বহুকাল পুত্রবৎ প্রজাপালন, দেব দ্বিজের সেবা, আর্ত দরিদ্রদের দান এবং সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করলেন। এই পুণ্যফলে অন্তিমকালে তাঁর ব্রহ্মলোকে স্থিতি হয়। ব্রহ্মার সান্নিধ্যে বহুকাল কাটে নৃপতির। একদিন ব্রহ্মা মহাতপা সিদ্ধ মুনি ঋষিদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে ধ্যানাসনে বসে আছেন। সেখানে উপস্থিত মহারাজ মহাভিষও। এই সময়ে সেখানে এলেন গঙ্গাদেবী, হঠাৎ প্রবল বায়ু প্রবাহে গঙ্গার বক্ষাবরণ উড়ে গেল। তা দেখে সমস্ত সিদ্ধ মুনি ঋষিরা চক্ষু নিমিলিত করে মস্তক অবনত করেন। রাজা মহাভিষ গঙ্গার অপরূপ অঙ্গসৌষ্টব দেখে মোহিত হয়ে নিশ্চল নয়নে তাকিয়ে থাকেন। মহাভিষের অনুপম রূপে মুগ্ধা গঙ্গাও তাঁর দিক থেকে দৃষ্টি ফেরাতে পারলেন না। তাঁদের এই ভাব এবং দৃষ্টি দেখে প্রজাপতি ব্রহ্মা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। ব্রহ্মলোকে মনুষ্যোচিত আচরণের জন্য তাঁদের মর্ত্যলোকে মনুষ্য জন্ম গ্রহণের জন্য অভিশাপ দেন। অভিশপ্ত মহাভিষ ও গঙ্গার দ্রুত মর্ত্যে পতন হয়।

মর্ত্যে কুরুবংশীয় মহারাজ প্রতীপের বিশাল রাজ্য। অতুল ঐশ্বর্য, সীমাহীন গোশালা গোধনে পরিপূর্ণ। ঘরে সতী সাধ্বী স্ত্রী। কিন্তু মহারাজ প্রতাপের মনে শান্তি নেই, কারণ তাঁর একমাত্র পুত্র দেবাপি অল্প বয়সে সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেছে। মনের দুঃখে মহারাজ প্রতীপ প্রাসাদ ত্যাগ করে গঙ্গাতীরে অবস্থান করছেন। জপ তপ আর নিত্য বেদ অধ্যয়ন করে তাঁর সময় কাটে। এই বিশাল রাজ্য কার হাতে দিয়ে যাবেন? সর্বদা এই চিন্তায় তিনি আচ্ছন্ন থাকেন। নৃপতির বয়স হয়েছে কিন্তু জরা তাঁকে স্পর্শ করেনি, রূপে তিনি কামদেবসম। একদিন তিনি গঙ্গাতীরে উপবিষ্ট, চিন্তাক্লিষ্ট। সেই একই চিন্তা, যোগ্য উত্তরাধিকারী। এমন সময় হঠাৎ গঙ্গাদেবী জল থেকে উত্থিতা হলেন। মহারাজ প্রতাপের অসাধারণ রূপে আকৃষ্টা হয়ে তিনি নৃপতির দক্ষিণ উরুতে গিয়ে উপবেশন করলেন। গঙ্গার রূপে চারদিক উদ্ভাসিত হলো। রাজা বিস্মৃত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

—কন্যা, তুমি কে? তোমার কী অভিপ্রায়? আমার কাছে কী চাও তুমি?

গঙ্গা বললেন—

—হে কুরুশ্রেষ্ঠ, হে দিব্যকান্তি, চির তরুণ। আমি তোমার প্রতি আকৃষ্টা, তুমি আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করা, আমাকে ধন্য কর।

—হে বরাননে। তুমি পরস্ত্রী। পরস্ত্রী আমার কাছে মাতৃবৎ।

—আমি পরস্ত্রী নই, আমি দেবকন্যা। তুমি আমায় গ্রহণ করতে পারো।

—কন্যা! তুমি আমার দক্ষিণ উরুতে বসেছ। দক্ষিণ উরু পুত্রবধূর আসন, আর বাম উরু ভার্যার আসন। তোমাকে আমি পুত্রবধূ রূপে গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু ভার্যা রূপে নয়।

—রাজা তুমি ধর্ম অবতার। বিশ্বসংসারে তোমার মহিমা পরিব্যাপ্ত। তোমার বাক্য আমি মেনে নিলাম। তোমার পুত্রকে আমি পতিরূপে বরণ করব।

এই কথা বলে দেবী গঙ্গা অন্তর্হিতা হলেন।

কন্যার বাক্যে রাজা আনন্দিত হলেন। পুত্র লাভের আশায় সহর্ষে প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করে রানিকে সবিস্তারে সব ঘটনা অবগত করালেন। রাজদম্পতি বিধি অনুসারে নানা ব্রত নিয়মে রত হলেন। যথা সময়ে সর্বসুলক্ষণ যুক্ত এক পুত্রের জন্ম হলো। শান্তশীল পুত্র তাই পুত্রের নামকরণ হলো শান্তনু। তারপর আরও এক পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন রানি, তার নাম হলো বাহ্লীক। দুই পুত্র চন্দ্রকলার ন্যায় দিন দিন বাড়তে লাগল। শান্তনু রাজার প্রিয় পুত্র, ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারী রাজা তাঁকে সমস্ত রাজনীতি ও ধর্ম শিক্ষায় শিক্ষিত করলেন। এবার মহাভিষ রাজার বাণপ্রস্থে যাবার সময় উপস্থিত। রাজা শান্তনুর হাতে রাজ্যপাট অর্পণ করে রানি-সহ বনে গমন করবেন। যাবার সময় মহারাজ মহাভিষ শান্তনুকে একান্তে ডেকে বললেন—তপস্যা কালে জাহ্নবীতীরে এক দেবকন্যাকে আমি দৈবক্রমে পুত্রবধূ রূপে বরণ করেছিলাম। যথা সময়ে সে ফিরে আসবে বলে আমার কাছে অঙ্গীকার করেছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সেই দেবাঙ্গনার বাক্য মিথ্যা হবে না। সেই কন্যা তোমার কাছে যদি কখনও আসে তাকে তুমি যথারীতি স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে গ্রহণ করবে। তার কোনো ইচ্ছায় তুমি বাধা দেবে না। এই আদেশ দিয়ে বাণপ্রস্থে গমন করলেন রাজ দম্পতি।

হস্তিনাপুরের রাজা হলেন শান্তনু। সর্বগুণের অধিকারী মহা ধনুর্ধর রাজার মহিমায় চারদিক মুখরিত। একদিন জাহ্নবীর তীরে তিনি দেখলেন পদ্মকেশর বর্ণা সিক্তবসনা অপরূপা এক কন্যাকে। কন্যাকে দেখে শান্তনুর মন বিচলিত হলো। তিনি কন্যার নিকটে গিয়ে সবিনয়ে তার পাণি প্রার্থনা করলেন। কন্যা বললেন— বহুকাল পূর্বে তোমার পিতা মহারাজ মহাভিষ আমাকে পুত্রবধূ রূপে বরণ করেছিলেন। আমিও তাঁর কাছে অঙ্গীকার করেছিলাম যথাসময়ে আমি তাঁর পুত্রকে পতিরূপে স্বীকার করব। আজ হয়তো সেই সময় এসেছে তবে আমার একটি শর্ত তোমাকে পালন করতে হবে।

শান্তনু বললেন, তোমার কী শর্ত?

তুমি আমার কোনো কার্যে বাধা দিতে পারবে না। যেদিন তুমি আমার কার্যে বাধা দেবে এবং আমাকে কুকথা বলবে সেদিন আমি তোমাকে ত্যাগ করে আপন স্থানে চলে যাব।

রাজা শান্তনু বললেন—তোমার ইচ্ছায় আমি কোনোদিন বাধা দেব না এবং তোমাকে কোনোদিন কুবাক্যও বলবো না।

রাজা এইরূপ অঙ্গীকার করলে জাহ্নবী তাঁর সঙ্গে প্রাসাদে গেলেন। রাজার সঙ্গে তার বিবাহ সম্পন্ন হলো। দিব্যরত্ন ভূষণে সুসজ্জিতা মহারানি জাহ্নবী। নানা রঙ্গকেলিতে দিন অতিবাহিত হয় শান্তনু জাহ্নবীর দিবারাত্রি। এই সময় জাহ্নবীর স্মরণে আসে মুনি শাপে চিন্তাক্লিষ্ট অষ্টবসুর কথা। আপন আপন কৃতকর্মের জন্য মহামুনি বশিষ্ট অষ্টবসুকে অভিশপ্ত করেছেন নরযোনি লাভের জন্য। ভীত বসুগণ পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার স্মরণ নিয়েছেন তাঁদের উদ্ধারের জন্য। গঙ্গাও তাদের কাতর আবেদনে সাড়া দিয়ে স্বীকার করেছেন যে অষ্টবসুকে তিনি গর্ভে ধারণ করবেন এবং জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে মুক্ত করে দেবেন।

বৎসরান্তে গঙ্গা এক সর্বসুলক্ষণযুক্ত পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেন এবং জন্মমাত্র তাকে গঙ্গায় বিসর্জণ দিলেন। দ্বিতীয় বৎসরান্তেও একই ঘটনা ঘটালেন জাহ্নবী। এরপর একে একে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম সন্তানকেও জন্মমাত্র গঙ্গায় ভাসালেন জাহ্নবী। অষ্টম সন্তানের বিসর্জনের সময় শান্তনু আর সহ্য করতে পারলেন না। বাধা দিলেন, জন্মদাত্রী মাতার এহেন নিষ্ঠুরতা নিয়ে জাহ্নবীকে কুকথাও বললেন। ফল যা হবার তাই হলো, গঙ্গা শান্তনুকে বললেন— তুমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছ। তাই এবার আমি তোমার কাছে বিদায় নেব। তোমাকে এবার আমার সত্যকার পরিচয় দেব। আমি জাহ্নবী গঙ্গা। ত্রিলোকে আমার

গতি। আমার গর্ভে যে পুত্রদের জন্ম হয়েছে এরা অষ্টবসু। মহামুনি বশিষ্ঠের শাপে এরা নরযোনি প্রাপ্ত হয়েছিল। আমার গর্ভে জন্ম হয়ে এদের সাতজন মুক্ত হয়ে গেল। কনিষ্ঠ দিব্যবসু পত্নীর প্ররোচনায় বশিষ্ঠের পালিতা কামধেনু, সুরভীকন্যা নন্দিনীকে অপহরণ করেছিল, তাই তাকে সুদীর্ঘ মনুষ্যজীবন ভোগ করতে হবে। এই পুত্র দিব্যবসু, মাতার অদর্শনে পুত্র কাতর হবে, তাই আমি একে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। বাল্যাবস্থা অতিক্রম করলে একে তোমার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে যাব। তখন তুমি তাকে সর্বশিক্ষায় শিক্ষিত করে মানুষ করবে।

স্ত্রী-পুত্রের শোকে কাতর রাজা শান্তনু। গঙ্গাঅন্তপ্রাণ শান্তনু এই নবীন বয়সেও দ্বিতীয় ভার্যা গ্রহণ করেননি। সন্ন্যাসীর মতো রাজধর্ম পালন করছেন। রাজ্যের প্রজাদের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন সুখ শান্তি বিরাজমান। কিন্তু রাজার মনে শান্তি নেই। একদিন শান্তনু একাকী গঙ্গাতীরে ভ্রমন করছেন। তিনি অবাক হয়ে দেখছেন গঙ্গার নীর স্থির হয়ে আছে। কারণ অন্বেষণের জন্য শান্তনু কিছুদূর অগ্রসর হয়ে দেখেন কিয়দ্দূরে এক অতি রূপবান তরুণ যোদ্ধা বসে আছেন। হাতে তার ধনুক, শরজালে জাহ্নবীর জলকে স্তব্ধ করে রেখেছেন। রাজা তরুণের দিকে অগ্রসর হলে তরুণ তৎক্ষণাৎ গঙ্গায় প্রবেশ করে। একজন মানুষের পক্ষে অধিক সময় জলে ডুবে থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত, তরুণ আর জল থেকে বাইরে আসছে না। রাজা ক্রমে আরও কৌতূহলাক্রান্ত হলেন। এমন সময় সেই তরুণ যোদ্ধাকে সম্মুখে নিয়ে জল থেকে উঠে এলেন স্বয়ং জাহ্নবী। রাজাকে উদ্দেশ্য করে দেবী জাহ্নবী বললেন,

—রাজন তুমি চিন্তিত কেন? এই তোমার সন্তান, আমি এই পুত্রের জন্মদাত্রী, এর নাম দেবব্রত। ঋষি বশিষ্ঠের কাছে এর অস্ত্রশিক্ষা, ধনুর্বেদে এ ভৃগুরামের সমকক্ষ। সংসারে যত বিদ্যা নীতি, শাস্ত্র, ধর্ম, এই পুত্রের অগোচরে কোনো কিছুই নেই। মহারাজ, তোমার হাতে তোমার পুত্রকে সমর্পণ করলাম। তুমি একে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত কর।

এই বাক্য বলে দেবী জাহ্নবী অন্তর্ধান করলেন। গর্বিত পিতা, পুত্র দেবব্রতকে নিয়ে রাজধানী হস্তিনাপুরে এলেন। রাজপুত্রের পরিচয় পেয়ে রাজপ্রাসাদে আনন্দের লহর বয়ে গেল। শুভক্ষণ দেখে যথাবিধি যৌবরাজ্যে অভিষেক করা হলো দেবব্রতকে। যুবরাজ শান্তনুর হাতে রাজ্যের শাসনভার এবং রাজ্য রক্ষার ভার অর্পণ করতে হবে। প্রাজ্ঞ মন্ত্রী এবং বিশ্বাসভাজন সেনানায়কদের উপর যুবরাজ দেবব্রতের প্রশিক্ষণের ভার দেওয়া হলো। শান্তনু স্বয়ং সবকিছু তত্ত্বাবধান করছেন। মহর্ষি বশিষ্ঠের শিষ্য দেবব্রত, জননী জাহ্নবীর অনুরোধে তাকে যুদ্ধবিদ্যা ও রাজবিদ্যায় পারদর্শী করেছেন। যুদ্ধ ও রাজনীতির গূঢ় তত্ত্বসমূহ দেবব্রতের নখদর্পণে। মন্ত্রী, সেনাপতি এমনকী স্বয়ং রাজাও উপলব্ধি করলেন দেবব্রতের নতুন করে শেখার কিছু নেই। নিশ্চিন্ত রাজা শান্তনু এবার পুত্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করে নিজে মৃগয়া ও ভ্রমণে কালাতিপাত করতে লাগলেন। এই সময়ে একদিন তিনি কালিন্দীর তীরে ভ্রমণরত, এমন সময়ে হঠাৎ পদ্মগন্ধে চারদিক আমোদিত হলো। কিন্তু পদ্মফুল কোথাও দেখতে পেলেন না। পদ্মগন্ধের অনুসন্ধান করতে করতে তিনি একস্থানে দেখেন এক অসামান্যা রূপবতী কন্যা কালিন্দীতে খেয়া পারাপার করছে, আর তার শরীরেই পদ্ম গন্ধ। সুচারু নয়না, সুকেশী সেই কন্যাকে দেখে রাজা কামমোহিত হলেন। কন্যার পরিচয় নিতে গিয়ে জানলেন যে সে দাসরাজ্যের কন্যা। রাজা গেলেন সেই দাস রাজের কাছে। ধীবর, রাজাকে দেখে বিচলিত হলেন। রাজা বললেন ভয়ের কোনো কারণ নেই তিনি ধীবর রাজের কন্যার পাণিপ্রার্থী হয়ে এসেছেন। ধীবররাজ সবিশেষ অবগত হয়ে অত্যন্ত প্রীত হলেন। তিনি তাঁর পালিতা কন্যাকে রাজার সঙ্গে বিবাহ দিতে সম্মত হলেন একটা শর্তে।

এই কন্যার জন্ম সম্পর্কে একটি কাহিনি আছে। পুরাকালে পরিচর নামে এক রাজা বহু তপস্যার ফলে অযোনিসম্ভবা এক অসামান্যা রূপবতী কন্যাকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হন। নববধূর সঙ্গে নানা রঙ্গকেলিতে কালাতিপাত করছিলেন পরিচর। হঠাৎ একদিন পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে তিনি মৃগ মাংসে শ্রাদ্ধ করার জন্য আদিষ্ট হন। রাজা তৎক্ষণাৎ মৃগয়ার উদ্দেশ্যে বনে গমন করেন। বনে গিয়েও সর্বদা তাঁর স্ত্রীর কথা মনে হতে থাকে এবং একসময়ে তাঁর বীর্য স্খলন হয়। সেই বীর্য পাতায় সংরক্ষণ করে সঙ্গে স্থিত সঞ্চান পক্ষিকে দিয়ে রাজা প্রাসাদে রানির কাছে পাঠালেন। পোষা সঞ্চান যখন সেই বীর্য নিয়ে যাচ্ছিল তখন আর একটি সঞ্চানের সঙ্গে তার সংঘর্ষ হয়। ফলে সেই বীর্য যমুনার জলে পতিত হয়। দীর্ঘিকা নামে এক স্বর্গের বিদ্যাধরী মুনিশাপে মৎস্যজন্ম ধারণ করে যমুনার জলে বাস করছিল। এই বীর্যকে খাদ্য ভেবে সে গলাধঃকরণ করে এবং গর্ভবতী হয়। দশমাস পরে এই মৎস্যারূপী বিদ্যাধরী ধীবর রাজের পাতা জালে ধরা পড়ে। তীরে তুললে যমজ সন্তান প্রসব করে সেই বিদ্যাধরী মুক্ত হয়ে যায়। যমজ সন্তানের মধ্যে একটি পুত্র, একটি কন্যা। চেদিরাজ পরিচর পুত্রসন্তানটিকে গ্রহণ করে আর ধীবররাজের কাছে কন্যা সন্তানটি দেয়। সেই থেকে কন্যাটিকে ধীবররাজ আপন কন্যার মতো বড়ো করে তুলছে। অপরূপ সুন্দরী কন্যার গুণের শেষ নেই কিন্তু দোষের মধ্যে এই কন্যার সর্বাঙ্গে মাছের উৎকট গন্ধ। বিবাহযোগ্যা হলেও এই দোষের জন্য বিবাহ হচ্ছে না। ধীবররাজ কন্যাকে যমুনায় খেয়া পারাপারের কাজে নিয়োজিত করেছে। এই পথে অনেক মুনি ঋষিদের যাতায়াত, উদ্দেশ্য যদি কোনো মুনিঋষির কৃপায় তার দেহের এই উৎকট গন্ধ দূর হয়। একদিন এই ঘাটে এলেন শক্তির পুত্র মহামুনি পরাশর। কন্যাকে দেখে তিনি বিমোহিত হলেন। আপন পরিচয় দিয়ে মুনি সেই কন্যাকে কামনা করলেন। কন্যা করজোড়ে মুনিকে বললেন,

—আমি হীন জাতির কন্যা। আমার সর্বাঙ্গে মাছের দুর্গন্ধ।

আপনি আমাকে স্পর্শ করবেন কী ভাবে?

মুনি বললেন।

—আমার বরে তোমার শরীরের দুর্গন্ধ দূর হয়ে পদ্মগন্ধময় হবে।

—আমি কুমারী। বিবাহ হয়নি, আমি আপনার ভজনা করি কী প্রকারে?

—আমাকে ভজনা করলে তোমার কুমারিত্ব নষ্ট হবে না। তুমি অনূঢ়া থাকবে। আর কৈবর্ত কন্যা হলেও আমার বরে রাজার সঙ্গে তোমার বিবাহ হবে।

সঙ্গে সঙ্গে মৎস্যগত দূরীভূত হয়ে পদ্মগন্ধে ভরে গেল কন্যার শরীর।

মুনির বরে কন্যা পূর্বাপেক্ষা আরও সুন্দরী হলো। এইবার কন্যা মুনির কাছে প্রার্থনা করল।

—মুনিবর! যমুনার দুই তীরে লোকের যাতায়াত। জলে অনেক নৌকা। জনসমক্ষে আপনার ভজনা করলে উভয়েরই কলঙ্ক। আপনি এমন একটি উপায় নিরুপণ করুন যাতে কাউকেই কলঙ্কিত হতে না হয়।

মহামুনি পরাশর প্রখর যোগবলে যমুনার মধ্যখানে এক মায়াদ্বীপের সৃষ্টি করে চারদিকে গাঢ় কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন করলেন। সেই নিভৃতস্থানে পরাশর সেই কন্যাকে আলিঙ্গন করলেন। আর তাতেই কন্যা গর্ভবতী হলেন এবং যথা সময়ে ব্যাস নামে বিখ্যাত পুত্রের জন্ম দিলেন। কিছুদিন গোপনে লালন পালনের পর ব্যাসকে তাঁর পিতৃসকাশে পাঠান হয়। দ্বীপে জন্ম তাই তাঁর নাম দ্বৈপায়ন। পরবর্তীকালে বেদ বিভাজন করেছিলেন তাই বেদব্যাস। সব মিলিয়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। পিতৃসকাশে বেদব্যাস কঠোর তপস্যায় রত হন।

মৎস্যগন্ধা এখন পদ্মগন্ধা। এই অসাধারণ রূপবতী কন্যাকে দেখে বিমোহিত হস্তিনাপুরীর রাজা শান্তনু। তিনি ধীবরাজের কাছে তাঁর কন্যার পাণি প্রার্থনা করলেন। ধীবর রাজ এক মহাশর্ত আরোপ করলেন। কী সেই শর্ত? এই কন্যার পুত্রকে হস্তিনাপুরের উত্তরাধিকারী করতে হবে। হরিষে বিষাদ হলো রাজা শান্তনুর যুবরাত্বজ দেবব্রতকে বঞ্চিত করে তিনি ধীবর রাজের শর্তে রাজি হতে পারলেন না। ফিরে গেলেন প্রাসাদে কিন্তু তার মনে শান্তি নেই। সেই ধীবর কন্যাকে তিনি কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। পিতার এই বিমর্ষ ভাব যুবরাজ দেবব্রতের দৃষ্টি এড়াল না। তিনি অনুসন্ধান করে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হলেন। পিতার অগোচরে দেবব্রত রথে আরোহণ করে চলে গেলেন ধীবর পল্লীতে। ধীবর রাজের গৃহে পিতার সঙ্গে ধীবররাজ কন্যার বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে। ধীবররাজের সেই এক শর্ত দৌহিত্রের উত্তরাধিকার। দেবব্রত বললেন—

আমি আমার অধিকার ছেড়ে দিলাম।

ধীবর রাজের নতুন শর্ত। তুমি না হয় অধিকার ছেড়ে দিলে, কিন্তু তোমার পুত্রেরা অধিকার ছাড়বে কেন? তারা তো আমার নাতির ছেলেদের অধিকার কেড়ে নেবে।

বিচলিত হলেন না যুবরাজ দেবব্রত অকম্পিত কণ্ঠে বললেন,

—ধর্ম সাক্ষী রেখে আমি প্রতিজ্ঞা করছি আমি কোনোদিন বিবাহ করব না। তুমি সংশয় মুক্ত হলে?

সংশয় মুক্ত হলো কৈবর্তরাজ। মহারাজ শান্তনুর সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে সম্মত হলো। ভীষ্মের এই ভয়ংকর প্রতিজ্ঞা শুনে অন্তরীক্ষে দেবতারা জয়ধ্বনি দিলেন, পুষ্পবৃষ্টি করলেন। দৈববাণী হলো।

এই প্রতিজ্ঞা করে তুমি দেবতা, মনুষ্য ও অসুরদের মধ্যে এক অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছ। ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা তাই আজ থেকে তোমার নাম ভীষ্ম। আর সত্য করে যে কন্যাকে তুমি পিতার সঙ্গে বিবাহ দিতে যাচ্ছ সেই কন্যার নাম হবে সত্যবতী।

ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা শুনে দাসরাজ আপন কন্যাকে এনে ভীষ্মের সামনে উপস্থিত করেন। ভীষ্ম করজোড়ে সত্যবতীকে বলেন—

মা, এই রথে আরোহণ কর এবং তোমার গৃহে চল।

স্বয়ং সারথি হয়ে ভীষ্ম সত্যবতীকে নিয়ে প্রবেশ করলেন হস্তিনাপুরের প্রাসাদ অঙ্গনে। ততক্ষণে এই বার্তা প্রাসাদময় রাষ্ট্র হয়ে গেছে। সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগল। ভীষ্ম, ভীষ্ম ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হলো। ভীষ্ম সত্যবতীকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন পিতার দিকে। পিতার হস্তে সত্যবতীকে সমর্পণ করলেন। ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের অনুরোধ করলেন যথাবিধি শাস্ত্রীয় বিবাহের আয়োজন করতে। পুত্রের এহেন তৎপরতায় যৎপরোনাস্তি প্রীত হলেন মহারাজ শান্তনু, পুত্রকে ইচ্ছামৃত্যু বর প্রদান করলেন।

* * * * *

হস্তিনা নগরের প্রাসাদে আনন্দের হিল্লোল। সুখ সাগরে নিমজ্জিত মহারাজ শান্তনু ও রানি সত্যবতী। রানি গর্ভবতী, দশমাস গর্ভধারণের পর এক পরম সুন্দর পুত্রের জন্ম দিলেন রানি। অপরূপ সৌন্দর্যের জন্য পুত্রের নাম রাখা হয় চিত্রাঙ্গদ। কিছুদিন পর রানি আবার গর্ভধারণ করেন, যথা সময়ে আর এক রাজ চক্রবর্তী লক্ষণযুক্ত পুত্রের জন্ম দেন রানি। এই পুত্রের নামকরণ হয় বিচিত্রবীর্য। অগ্রজ ভীষ্মের স্নেহছায়ায় এই দুই রাজকুমার চন্দ্রকলার মতো বাড়তে থাকে এবং সর্ববিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠে। এই সময়ে হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো মহারাজ শান্তনুর মৃত্যু হয়। প্রাথমিক শোক কাটিয়ে মহারাজের পারলৌকিক ক্রিয়াকর্মাদি সমাপনের পর ভীষ্মের অভিভাবকত্বে চিত্রাঙ্গদ সিংহাসনে বসেন। চিত্রাঙ্গদ ক্রমে যৌবন প্রাপ্ত হলে যুদ্ধ বিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী হয়ে ওঠেন। রাজ্য শাসনের থেকে যুদ্ধে তাঁর আকর্ষণ ছিল বেশি। একা রথারোহণে চিত্রাঙ্গদ দেবতা, গন্ধর্ব, মনুষ্য সবাইকে পরাজিত করে। একদা গন্ধর্বরাজ চিত্ররথের সঙ্গে তাঁর ভয়ংকর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে চিত্ররথের হাতে চিত্রাঙ্গদ নিহত হন। এবার বিচিত্রবীর্যকে

সিংহাসনে বসানো হলো। বয়সে তরুণ বিচিত্রবীর্য। ভীষ্ম তার নামে রাজ্য শাসন করেন। রাজমাতা সত্যবতীর সঙ্গে পরামর্শ করে ভীষ্ম সিদ্ধান্ত নেন এবার ছোটো ভাইটির বিবাহ দিতে হবে। সুপাত্রীর খোঁজ করছেন ভীষ্ম। কাশীরাজের তিন কন্যার কথা শুনেছেন ভীষ্ম। রূপে, গুণে, বুদ্ধিমত্তায় তারা হস্তিনাপুরের রাজবধূ হওয়ার যোগ্য। দূত মারফত বিবাহের প্রস্তাব পাঠানোর কথা ভাবছেন ভীষ্ম। এমন সময় সংবাদ আসে কাশীরাজ তাঁর তিন কন্যার স্বয়ংবর সভার আয়োজন করেছেন। ভীষ্ম একাকী রথে উপস্থিত হলেন কাশীনগরে। রাজ প্রাসাদে তখন স্বয়ংবর সভার আয়োজন চলছে। অনেক রাজা মহারাজা উপস্থিত। বীরদর্পে ভীষ্ম প্রবেশ করলেন সভায়। কাশীরাজের তিন কন্যা—অম্বা, অম্বিকা, অম্বালিকা তিনজনকে বলপূর্বক তুললেন রথে। ঘোষণা করলেন—আমি দেবব্রত ভীষ্ম, আমার অনুজ শান্তনুপুত্র বিচিত্রবীর্যের জন্য এই তিন কন্যাকে বলপূর্বক নিয়ে যাচ্ছি, কারও যদি বাধা দেওয়ার অভিলাষ থাকে অগ্রসর হও। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনা উপস্থিত রাজন্যবর্গের পৌরুষে আঘাত করলো। তাঁরা যৌথভাবে ভীষ্মকে আক্রমণ করলেন। বশিষ্ঠ শিষ্য মহাবীর ভীষ্মের শরাঘাতে কেউ ধরাশায়ী হলো কেউ-বা পলায়ন করলো। বিজয়ী ভীষ্মের রথ এগিয়ে চলল হস্তিনা নগরীর দিকে। কিয়দ্দূর অগ্রসর হতে দেখা গেল পিছনে এক রথ অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছে। রথ থেকে চিৎকার করছে শাল্ব রাজা,

দাঁড়াও ভীষ্ম। সাহস থাকে আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর।

রথ থামালেন ভীষ্ম, অকস্মাৎ শাল্বরাজার তির ছুটে এল ভীষ্মের দিকে। ভীষ্ম আত্মরক্ষা করলেন। এবার ভীষ্মের নিক্ষিপ্ত তিরে প্রাণ হারাল রথের অশ্ব ও সারথি। রথ থেকে নেমে পালাচ্ছে শাল্বরাজা। ভীষ্ম তাকে প্রাণভিক্ষা দিলেন। আবার দ্রুত গতিতে অশ্বচালনা করলেন ভীষ্ম। পৌঁছে গেলেন হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদে। বহুদিন পরে আবার হস্তিনাপুরের রাজ প্রসাদ আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল। আবার ব্রাহ্মণ পুরোহিত ডেকে বিবাহের আয়োজন। পাত্র একজন পাত্রী তিন। বিবাহ বাসর থেকে কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বা ভীষ্মের উদ্দেশ্যে বলল—

মহাবাহু ভীষ্ম, আমার একটি নিবেদন আছে। আমার পিতার আহ্বানে আমাদের সয়ম্বর সভায় যে সকল নৃপতি উপস্থিত হয়েছিল তাঁদের মধ্যে আমি শাল্বরাজাকে মনে মনে পতিরূপে বরণ করেছি। আমার পিতারও তাতে সম্মতি ছিল। আপনি শাল্ব রাজাকে ডেকে তাঁর হাতে আমাকে অর্পণ করুন।

ভীষ্ম তখন অম্বাকে শাল্ব রাজার কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু শাল্ব অম্বাকে গ্রহণ করলেন না। আবার হস্তিনাপুরে ফিরে এলেন অম্বা। এবার অম্বার অন্য রূপ। সমস্ত ঘটনার জন্য ভীষ্মকে দোষারোপ করলেন তিনি। ভীষ্মের কারণে শাল্ব অম্বাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ভীষ্ম অম্বার হাত ধরে তাকে রথে তুলেছেন। হাত ধরা বা পাণিগ্রহণ বিবাহের অঙ্গ। অতএব হাতধরে ভীষ্ম বিবাহের প্রথম শর্ত পালন করেছেন। অম্বার দাবি ভীষ্মকেই অম্বাকে বিবাহ করতে হবে। ভীষ্ম বললেন—

আমি বিবাহ করবো না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, বিবাহ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তুমি এই জগতে যাকে পতিরূপে বরণ করতে চাও আমি দায়িত্ব নিয়ে তার সঙ্গে তোমার বিবাহ দেব।

অম্বা বলল—

তুমি ছাড়া আর কাউকে আমি পতিরূপে পেতে চাই না।

আমি অপরাগ। আমায় ক্ষমা কর।

ক্ষমা আমি তোমায় করবো না। তুমি যদি আমায় এজন্মে বিবাহ না কর তবে পরজন্মে আমি তোমার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াব।

এই কথা বলে অম্বা এক অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করে তাতে আত্মাহুতি দিলেন।

বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে অপরূপ সুন্দরী রাজকন্যাদ্বয় অম্বা ও অম্বালিকার বিবাহ হলো। নবীন বিচিত্রবীর্য, সঙ্গে দুই সুন্দরী তরুণী ভার্যা। তারা বিবিধ শৃঙ্গার কলায় রত। রাজপাট সামলাচ্ছেন স্বয়ং ভীষ্ম। রাজ্যের সর্বত্র নিরবচ্ছিন্ন সুখ শান্তি বিরাজ করছে। কিন্তু অশান্তির কালো মেঘ দেখা দিল হস্তিনার রাজপ্রাসাদে। অতিরিক্ত রতিক্রীড়ার ফলে বিচিত্রবীর্য ক্ষয়রোগে আক্রান্ত। ভীষ্ম কনিষ্ঠকে বাঁচানোর জন্য সবরকম চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। অল্পদিনের মধ্যে আয়ুর্বেদাচার্যদের সবরকম প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে তরুণ বয়সে বিচিত্রবীর্যের প্রয়াণ ঘটল। রাজপ্রাসাদে আবার শোকের ছায়া, উঠল কান্নার রোল। প্রকৃতির নিয়মে শোক তাপেরও একসময়ে অবসান হয়। হস্তিনার রাজপ্রাসাদও একসময় শান্ত স্বাভাবিক হলো। রাজমাতা সত্যবতী একদিন কুমার ভীষ্মকে আপনকক্ষে ডেকে পাঠালেন বিশেষ মন্ত্রণার জন্য। যথা সময়ে ভীষ্ম উপস্থিত হলেন রাজমাতার কক্ষে যথাবিহিত প্রণতি জানিয়ে উপবেশন করলেন নির্দিষ্ট আসনে। সত্যবতী বললেন—

পুত্র, এক বিশেষ কারণে আজ তোমাকে আমি আহ্বান করেছি তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে আমার দৃঢ় বিশ্বাস তুমি আকাকে নিরাশ করবে না।

—অনুরোধ কেন মা, তুমি আমায় আদেশ করো।

—পুত্র, তুমি সর্বজ্ঞ, সর্ব বিদ্যায় পারদর্শী, সংকটকালে বৃহস্পতি দেবতাদের তারণ করেন, দৈত্যদে করেন গুরু শুক্রাচার্য। আজ কুরুবংশের মহা সংকট কাল। পুত্র, একমাত্র তুমিই এই মহা সংকটে কুরুবংশকে তারণ করতে পার। আমার কারণে তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে, আজ আমি তোমাকে অনুরোধ করছি সেই প্রতিজ্ঞা তুমি তুলে নাও। রাজা হয়ে প্রজা শাসন করো। পুত্র উৎপাদন করে এই মহান কুরুবংশকে রক্ষা করো।

—মাতা, তোমার আদেশে আমি স্বহস্তে নিজ মস্তক ছেদন করে তোমার পদতলে অর্পণ করতে পারি। কিন্তু তোমার এই আদেশ পালনে আমি অসমর্থ; প্রতিজ্ঞা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, কোনো

কিছুর বিনিময়ে এই প্রতিজ্ঞা আমি ভঙ্গ করতে পারবো না। সূর্য যদি তেজ ত্যাগ করে, চন্দ্র যদি শীতলতা ত্যাগ করে, ধর্ম যদি সত্য ত্যাগ করে, ইন্দ্র যদি পরাক্রম ত্যাগ করে, তথাপি গঙ্গাপুত্র ধর্ম ত্যাগ করবে না।

—তবে কি কুরুবংশ রক্ষা হবে না? অচিরে বিনাশ হবে এই জগৎবিখ্যাত বংশ? একে রক্ষা করার কি কোনো উপায় নেই?

এই কথাগুলি বলে রাজমাতা সত্যবতী বিলাপ করতে লাগলেন। ভীষ্ম তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,

—মাতা! রোদন পরিত্যাগ কর। শান্ত হও, শাস্ত্রে এর বিধান আছে। পূর্বে কার্তবীর্যার্জুন নামে এক নৃপতি জমদগ্নি মুনিকে অপমান এবং সংহার করলে জামদগ্ন পরশুরাম প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য একুশবার ক্ষত্রিয় নিধন করে ধরণী নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন। ক্ষত্র-নারীগণ তখন পুত্রার্থে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের ঘরে প্রবেশ করেন। বেদবিধি অনুসারে ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্র-নারীদের পুত্রদান করে ক্ষত্রকুল রক্ষা করেছিলেন। ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্ম হলেও ক্ষেত্রজ রূপে তারা ক্ষত্রিয় পরিচয় পেয়েছিল। বিপ্র থেকে ক্ষাত্রজন্ম পূর্বাপর বিধিসম্মত। এতে শাস্ত্র কোনো দোষ দেখে না। ক্ষত্রিয়ের অভাবে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিকাঠামো ভেঙ্গে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ এঁরা বলীরাজ মহিষী সুদেষ্ণার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে রাজা বলীর ক্ষেত্রজ সন্তান। এখন এই বিষয়ে তুমি বিচার কর প্রয়োজনে মন্ত্রী, পুরোহিতগণের পরামর্শ নিতে পার।

রাজমাতা সত্যবতী বললেন। পুত্র, তুমি ব্রহ্মচারী। সর্ববিদ্যা বিশারদ তোমার কথা আমার কাছে বেদবাক্য। পুত্র তোমার কাছে আমি আমার জীবনের একটি অত্যন্ত গোপন কথা বলব। যে কথা অদ্যাবধি কারও কাছে প্রকাশ করিনি। পুত্র প্রথম যৌবনে আমি পিতার সঙ্গে যমুনার ঘাটে খেয়া পারাপার করতাম। একদিন ঘাটে এলেন মহামুনি পরাশর, জ্যোতির্ময় মূর্তি। অদ্ভুত তাঁর ক্ষমতা। তিনি যমুনায় এক মায়া দ্বীপের সৃষ্টি করলেন, চারদিকে কুজ্ঝটিকা। আমি ভীতা হয়ে তাঁর বশীভূত হলাম। তাঁর ঔরসে আমার গর্ভে এক সন্তানের জন্ম হলো। কৃষ্ণবর্ণ তাই নাম কৃষ্ণ।, দ্বীপে জন্ম তাই দ্বৈপায়ন, বেদ বিভাজন করেছেন তাই বেদব্যাস।

—চমকে উঠলেন ভীষ্ম বললেন।

—মাতা, জগৎবিখ্যাত মহর্ষি বেদব্যাস তোমার পুত্র! আমার অগ্রজ?

—দ্বৈপায়ন যখন আমার কাছে প্রথম বিদায় নেয় তখন অঙ্গীকার করেছিল, আমি শরণ করা মাত্র সে আমার কাছে আসবে।

—মাতা, তুমি কুরুবংশের এই সংকটকালে তোমার আত্মজ মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেবকে শরণ কর। তিনি নিশ্চয়ই এই সংকট থেকে কুরুকুলকে পরিত্রাণ করবেন।

মায়ের বার্তা নিয়ে কুরুবংশের রাজ পুরোহিত গেলেন পুত্র ব্যাসদেবের কাছে। পুরোহিতের বার্তা পেয়ে প্রথমে ব্যাসদেব কিছুটা হতচকিত হলেন। এতকাল পরে জননীর বার্তা! কালবিলম্ব না করে তিনি যাত্রা করলেন হস্তিনার পথে।

কয়েক দিবসের মধ্যে তিনি উপস্থিত হলেন হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদে। বহুকাল পরে মাতা-পুত্রের সাক্ষাৎ। মায়ের অশ্রুধারায় স্নাত হলেন পুত্র ব্যাসদেব। মাকে শান্ত করে ব্যাসদেব বললেন—

—হে জননী, এইবার বলুন কেন আমাকে শরণ করেছেন? আপনার কোন প্রিয়কার্য আমার দ্বারা সম্ভব?

রাজমাতা সত্যবতী তাঁর বিবাহ, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, দুই পুত্রের জন্ম, মহারাজ শান্তনুর মৃত্যু, চিত্রাঙ্গদের গন্ধর্ব হস্তে নিধন, কনিষ্ঠ বিচিত্রবীর্যের বিবাহ এবং অকালপ্রয়াণ সমস্ত ঘটনা একে একে বিবৃত করলেন ব্যাসদেবের কাছে। সব কথা শুনে ব্যাসদেব বললেন,

—মাতা, এখন আমার কী করণীয়?

—পুত্র এখন একমাত্র তুমিই পার এই কুরুবংশকে রক্ষা করতে।

—আমি। তা কী করে সম্ভব?

—আগে প্রতিজ্ঞা কর তুমি মাতৃআজ্ঞা পালন করবে?

কিছুক্ষণ নীরব থেকে ব্যাসদেব বললেন—

—আমি প্রতিজ্ঞা করলাম, মাতৃআজ্ঞা যথাযথ পালন করবো। এবার বল আমার করণীয় কী?

—কুরুবংশ রক্ষার জন্য তোমাকে তোমার ভ্রাতৃবধূর গর্ভে সন্তান দিতে হবে।

—মাতঃ আমি যে ব্রহ্মচারী। নারীদেহ আমার স্পর্শ করতে নেই।

—জগৎখ্যাত এক বংশের রক্ষা, আর মাতৃআদেশ পালনের জন্য এই কর্মে তোমার কোনো অধর্ম হবে না পুত্র।

—যথা আজ্ঞা মাতা, তুমি বধূকে শুচিশুদ্ধ হয়ে থাকতে বলবে, আমি যথা সময়ে তার শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করবো।

রাজমাতার নির্দেশে রাজবধূ অম্বিকা শুচি শুদ্ধ হয়ে পালঙ্কে অপেক্ষা করছেন। গর্ভাধান কাল সমাগত হলে ব্যাসদেব প্রবেশ করলেন অম্বিকার শয়ন মন্দিরে। তাঁর দেহ কৃষ্ণবর্ণ, পিঙ্গল জটাভার, ভৈরবমূর্তি। সেই মূর্তি দেখে বধূ অম্বিকা ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করলেন। রজনী অবসানে ব্যাসদেব স্নান দানাদি সম্পন্ন করলেন। তখন মাতা সত্যবতী ব্যাস সকাশে এসে কুশল বার্তা জিজ্ঞাসা করলেন। প্রত্যুত্তরে ব্যাস বললেন—

—মাতা, বধূ এক বলবান বুদ্ধিমান পুত্র লাভ করবেন। কিন্তু আমার ভয়ংকর মূর্তি দর্শনে তিনি চক্ষু মুদ্রিত করেছেন। তাই সেই পুত্র হবে জন্মান্ধ।

রাজমাতা ও ভীষ্ম দু'জনেই বিষাদগ্রস্ত হলেন। কুরুবংশের নৃপতি হবে অন্ধ! এ অসম্ভব। সত্যবতী আবার ব্যাসদেবকে অনুরোধ করলেন। এবার রাজবধূ অম্বালিকা। পূর্বকথা স্মরণ করে অম্বালিকা চক্ষু মুদ্রিত করলেন না। তবে মহর্ষির উগ্র ভৈরব মূর্তি

দেখে তাঁর মুখমণ্ডল রক্তশূন্য হয়ে গেল। ব্যাসদেব সত্যবতীকে জানালেন এবারে যে পুত্রের জন্ম হবে সেও বল, বীর্য ও বুদ্ধিতে অগ্রণী হলেও পাণ্ডুবর্ণ হবে। মাতা সত্যবতী তাঁকে এক সর্বসুলক্ষণযুক্ত পুত্র দান করার জন্য তৃতীয়বার অনুরোধ করলেন। এবার রাজবধূরা ভয়ে আর কেউ এল না, পাঠাল এক সুন্দরী শূদ্রাণী দাসীকে। সেই ভক্তিমতী শূদ্রাণী দাসী শয়নমন্দিরে ব্যাসদেবের অর্চনা ও সেবা করে তাঁকে পরিতুষ্ট করেন। দাসীর আচরণে প্রীত হয়ে ব্যাসদেব তাকে এক সর্বসুলক্ষণযুক্ত দেবতুল্য পুত্র লাভের বর প্রদান করেন। যথাসময়ে ধর্ম এসে সেই শূদ্রাণী দাসীর গর্ভে প্রবেশ করেন। মাতৃআজ্ঞা পালন এবং মায়ের কার্যসিদ্ধির পর তিনি আবার ভারত পরিক্রমায় বহির্গত হবেন। মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাবার সময় ভীষ্মকে নিভৃতে ডেকে বললেন।

—ভ্রাতা, সাবধান, অদূর ভবিষ্যতে তোমার এই বংশে এমন সব দুরাচারের সৃষ্টি হবে, তারা এই বংশ ধ্বংস করবে। আমি দিব্য দৃষ্টিতে তা দেখতে পাচ্ছি। ভীষ্ম অনেকদূর পর্যন্ত মহর্ষির অনুগমন করলেন। তারপর ব্যাসদেব চলে গেলেন তার নির্দিষ্ট গন্তব্যে।

* * * *

হস্তিনাপুরের রাজপ্রসাদে তিনপুত্র ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর ধীরে ধীরে বড়ো হচ্ছে। ভীষ্ম তিন পুত্রকে সন্তানবৎ পালন করছেন। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ, তাই তার প্রতি ভীষ্মের মায়া বেশি। অল্পবয়সে তিনপুত্র সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে ওঠে। অন্ধ হলেও ধৃতরাষ্ট্র অতুল বলশালী। মুষ্টিবদ্ধ করে প্রস্তরখণ্ড চূর্ণ করতে পারে। তিরন্দাজিতে অব্যর্থ লক্ষ্য পাণ্ডুর। আর বিদুর সর্বশাস্ত্রে বিশারদ ধর্মপরায়ণ। তিন কুমার ক্রমে বাল্য কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পদার্পণ করেন। ভীষ্ম তাদের বিবাহের জন্য চিন্তিত হন। গান্ধাররাজ সুবলের কন্যা গান্ধারী। রূপে গুণে অনন্যা। দীর্ঘ দিন ব্রত করে দেবতাকে তুষ্ট করে শতপুত্র লাভের বর পেয়েছেন। ভীষ্ম গান্ধারে কনিষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহের বার্তা দিয়ে দূত পাঠালেন। কুরুবংশের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক পরম গৌরবের, কিন্তু বর যে জন্মান্ধ। তথাপি হস্তিনার দূতকে ফেরাবার সাহস দেখালেন না গান্ধাররাজ। ভীষ্ম রুষ্ট হলে মহাবিপদ হতে পারে। তিনি এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন। এবার প্রচুর যৌতুক সামগ্রী সহ কনিষ্ঠপুত্র শকুনির সঙ্গে গান্ধারীকে পাঠালেন হস্তিনার প্রাসাদে। গান্ধারী যখন শুনলেন তাঁর পতিদেবতা জন্মান্ধ তখন তিনি সেটা তাঁর অদৃষ্ট বলে মেনে নিলেন এবং শুক্ল পট্টবস্ত্র দ্বারা আপন চক্ষুদ্বয় আচ্ছাদিত করলেন। হস্তিনা নগরীর প্রাসাদে কুরুকুলের জ্যেষ্ঠা কুলবধূ হলেন গান্ধারী। সতী, সাধ্বী, সেবা পরায়ণা গান্ধারী অল্প সময়ের মধ্যে সকলের স্নেহ ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন।

এবার ভীষ্ম চিন্তিত পাণ্ডুর বিবাহের জন্য। কুন্তীভোজের পালিতা কন্যা কুন্তীর স্বয়ংবর সভা ভোজ রাজ্যে। নানা দেশের রাজন্যবর্গ আমন্ত্রিত। পাণ্ডুও আমন্ত্রিত। সভায় তারামণ্ডলের মধ্যে চন্দ্রমার ন্যায় বিরাজ করছেন পাণ্ডু। প্রাসাদের গবাক্ষ দিয়ে পাণ্ডুকে দেখে তাকে পতিরূপে বরণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন কুন্তী। স্বয়ংবরে পাণ্ডুর গলায় মাল্যদান করলেন কুন্তী। রাজবধূ হয়ে হস্তিনাপুরের প্রাসাদে এলেন কুন্তী। পাণ্ডুর সঙ্গে কুন্তীর মিলনে হস্তিনাপুরে উৎসব শুরু হলো। দুই কুমারের বিবাহ সুসম্পন্ন হলো। ভীষ্ম এবার তৃতীয় কুমার বিদুরের বিবাহের জন্য তৎপর হলেন। সুদেব রাজার কন্যা পরাশরীর সঙ্গে বিবাহ হলো বিদুরের। পরাশরী অসামান্যা রূপবতী ধর্মশীলা, বিদুরের সমতুল্যা।

কয়েক বৎসর অতিবাহিত হলো। গান্ধারী বা কুন্তীর সন্তান হয় না। ভীষ্ম চিন্তিত, মদ্ররাজকন্যা মাদ্রীর সঙ্গে পাণ্ডুর পুনরায় বিবাহ দিলেন। ভীষ্মের নির্দেশে পাণ্ডু চললেন দিগ্বিজয়ে। মিথিলা, মগধ প্রভৃতি রাজ্য একে একে জয় করলেন। হস্তিনার ধনভাণ্ডার বিস্ফারিত হচ্ছে। অবশেষে ভীষ্মের আজ্ঞা নিয়ে কুন্তী, মাদ্রী-সহ পাণ্ডু গেলেন মৃগয়ায়। দৈববশে বধ করলেন এক মৃগরূপী মুনি কুমারকে। অভিশপ্ত হলেন—স্ত্রীঅঙ্গ স্পর্শে তাঁর মৃত্যু হবে। অরণ্যের ঋষিরা ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদনের পরামর্শ দিলেন। এইবার কুন্তী প্রকাশ করলেন এক গোপন কথা। পিত্রালয়ে অতিথি সেবার ভার ছিল কুমারী কুন্তীর উপর, একবার রাজপ্রাসাদে অতিথি হয়ে এলেন মুনি দুর্বাসা। ভক্তিভরে তার সেবা করলেন কুমারী কুন্তী। কুন্তীর সেবায় পরিতুষ্ট হয়ে তাকে এক গোপন মন্ত্র দান করলেন দুর্বাসা। ওই মন্ত্র জপ করে যে দেবতাকে তিনি আহ্বান করবেন, তৎক্ষণাৎ সেই দেবতা তার কাছে আসবেন। একটা কথা গোপন করলেন যে সেই মন্ত্র লাভ করার পর তিনি মন্ত্রের যথার্থতা যাচাই করার জন্য মন্ত্র জপ করে সূর্য দেবতাকে আহ্বান করেন। সূর্য তাঁর সামনে উপস্থিত। সূর্যের আগমন ব্যর্থ হলো না। সূর্যের বরে এক মহাতেজা সর্বসুলক্ষণযুক্ত পুত্র লাভ হয়েছিল তাঁর। কর্ণরন্ধ্র দিয়ে জন্ম হয়েছিলেন বলে সেই পুত্রের নাম কর্ণ।

পাণ্ডু হৃষ্টচিত্তে পুত্রার্থে সর্বপ্রথম ধর্মকে আহ্বান করার জন্য কুন্তীকে পরামর্শ দিলেন। ধর্মের আগমনে যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয়। পাণ্ডুর পরামর্শে দ্বিতীয়বার পবন দেবকে আহ্বান করেন কুন্তী। পবনদেবের কৃপায় মহাবলী ভীমের জন্ম হয়। তৃতীয়বার ইন্দ্রকে আহ্বান করার জন্য পাণ্ডু কুন্তীকে বললেন। ইন্দ্রের আগমনে কুন্তীর গর্ভে আসেন অর্জুন। কুন্তীর তিন পুত্র লাভ হলো। মাদ্রী নিঃসন্তান, তিনি পাণ্ডুকে বললেন কুন্তীকে অনুরোধ করার জন্য যাতে সেই মন্ত্রে কোনো দেবতাকে আহ্বান করে তার পুত্র লাভ হয়। পাণ্ডুর অনুরোধে কুন্তী মাদ্রীকে একবারের জন্য সেই মন্ত্র দিতে স্বীকার করেন। মাদ্রী একমন্ত্র জপ করে যুগ্ম দেবতা অশ্বিনী কুমারকে আহ্বান করলেন। অশ্বিনী কুমারের আগমনে মাদ্রীর জমজ পুত্রের জন্ম হলো নকুল ও সহদেব।

পাণ্ডু মহানন্দে কুন্তী, মাদ্রী আর পাঁচ পুত্রকে নিয়ে বনে বনে

ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ততদিনে যুধিষ্ঠিরের জন্মের সংবাদ হস্তিনাপুরের প্রাসাদে পৌঁছে গেছে। ভীষ্মসহ কুরুবংশের সবাই আনন্দিত, বিচলিত হলেন গান্ধারী, চিন্তিত ধৃতরাষ্ট্র। গান্ধারী এখনো পুত্রের জন্ম দিতে পারেননি। কুন্তীর পুত্রই হবে কুরুপতি, হস্তিনাপুরের রাজা। গান্ধারী গর্ভধারণ করেছেন কিন্তু যথা সময় অতিক্রান্ত হলেও তার সন্তান প্রসব হয় না। দুই বৎসর অতিক্রান্ত তথাপি প্রসবের লক্ষণ দেখা যায় না। একদিন গান্ধারী ক্ষোভে হতাশায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে আপন উদরে গদাঘাত করেন। সেই প্রচণ্ড আঘাতে গান্ধারীর গর্ভপাত হয়, হস্ত, পদ, মুণ্ডহীন এক মাংসখণ্ড কিন্তু জীবন্ত। গান্ধারী সেবিকাকে এই মাংসপিণ্ড আবর্জনার স্তূপে পরিহার করার নির্দেশ দেন। এই সময়ে প্রাসাদে উপস্থিত হলেন স্বয়ং বেদব্যাস। তিনি এই মাংসপিণ্ড রক্ষা ও বিভাজন করে ঘৃতপূর্ণ পাত্রে স্থাপনের পরামর্শ দেন। ঋষিবাক্য অব্যর্থ, এই মাংসপিণ্ড থেকে পুত্রের জন্ম হবে। একশত এক ভাগে বিভাজিত হলো সেই মাংসপিণ্ড। স্থাপিত হলো ঘৃতপূর্ণ পাত্রে। কিছুদিন পরে জন্ম হলো এক পুত্রের। জন্মমাত্র নানা কুলক্ষণে হস্তিনাপুর প্রপূরিত হলো। ভীষ্ম, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র-সহ কৌরবরা ছুটে এলেন। জন্মমাত্র সেই নবজাতক শকুনের মতো ডাকতে শুরু করে, সেই ডাক শুনে নগরের সব শকুন ডাকতে থাকে। পেঁচক, শৃগালসহ অশুভ ইঙ্গিতকারী পশুপাখিদের চীৎকারে নগরের লোক ভীত হয়ে ওঠে। মহামতি বিদুর ভীষ্মকে পরামর্শ দেন এই জাতক কুলধ্বংসী হবে, একে এক্ষুনি পরিত্যাগ করা উচিত। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র সম্মত হলেন না, রক্ষা পেল শিশু, সেই শিশুর নাম দুর্যোধন। সেই দিন দুর্যোধনের জন্ম হয় সেই দিনই অরণ্যে জন্ম হয় কুন্তীপুত্র ভীমের। ক্রমে ক্রমে সেই মাংসপিণ্ড থেকে আরও নিরানব্বই পুত্র এবং এক কন্যার জন্ম হয়। ধৃতরাষ্ট্রের আর এক পত্নী যে বৈশ্য কন্যা, তার গর্ভেও এক সন্তানের জন্ম হয় তার নাম যুযুৎসু। পুত্রেরা একসঙ্গে বড়ো হতে থাকে।

কুন্তী-মাদ্রীর পুত্রেরাও ক্রমে বড়ো হতে থাকে অরণ্যে। পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, সর্বদা মিলে মিশে থাকে। পাণ্ডুও নিশ্চিন্তে অরণ্যের শোভা উপভোগ করে আর মৃগয়া করে কালাতিপাত করছেন। একদিন মাতা কুন্তীর কাছে রয়েছে পাঁচ পুত্র। পাণ্ডু আর মাদ্রী বেরিয়েছেন অরণ্যের শোভা দর্শনে। বসন্ত ঋতু অপরূপ সাজে সজ্জিতা বনানী। শাখায় শাখায় পুষ্পসম্ভার। কুঞ্জে কুঞ্জে কোকিলের কুহুধ্বনি। উচ্ছসিত বসন্ত পবন, সঙ্গে সুন্দরী তরুণী ভার্যা। মদন বাণে জর্জরিত পাণ্ডু মৃগ-ঋষির অভিশাপ বিস্মৃত হয়ে স্ত্রী রমণে উদ্যত হন মাদ্রীর শত বাধা উপেক্ষা করে। অব্যর্থ ঋষির অভিশাপ, মৃত্যুমুখে পতিত হলেন পাণ্ডু। মাদ্রীর আর্তনাদে অরণ্যবাসীরা ছুটে এল। খবর গেল কুন্তীর কাছে। পাঁচ পুত্রকে নিয়ে ছুটে এলেন কুন্তী। মাদ্রীর কাছে শুনলেন সমস্ত বৃত্তান্ত। কুন্তী সহমরণে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত তাকে নিরস্ত করলেন মাদ্রী, বললেন, —দিদি, তোমাকে বাঁচতে হবে এই পঞ্চপাণ্ডবের জন্য। ওদের মানুষ করতে হবে। আমার কারণে স্বামীর মৃত্যু। আমি হব তার সহগামিনী। আমার দুই পুত্রকে তুমি মানুষ করো। ওদের মায়ের অভাব বুঝতে দিও না।

এই কথা বলে মাদ্রী পাণ্ডুর মৃতদেহকে আলিঙ্গন করে মূর্ছিত হয়। সেই মূর্চ্ছা আর ভাঙে না। অরণ্যবাসী স্থানীয় উপজাতিরা শব বহন করে নিয়ে চলল, সঙ্গে ঋষি মুনি আর পঞ্চপুত্র নিয়ে কুন্তী। এই দুঃসংবাদ আগেই পৌঁছে গেল ভীষ্মের কাছে। ভীষ্ম বিদুর-সহ অন্যান্য পুরজনেরা এগিয়ে এসেছেন। ঋষিদের কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনলেন ভীষ্ম, যমুনা তীরে চিতা নির্মাণের আদেশ দিলেন। এক চিতায় ভস্মীভূত হলো পাণ্ডু ও মাদ্রীর পার্থিব শরীর। হস্তিনাপুরে ক্রন্দনের ধ্বনি আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করল। পঞ্চপাণ্ডবকে বুকে টেনে নিলেন পিতামহ ভীষ্ম। তাঁর নতুন দায়িত্ব এই পিতৃহীন শিশুদের পিতৃস্নেহ দিয়ে মানুষ করা।

* * * * *

একসঙ্গে বেড়ে উঠছে একশত ছয়টি বালক। পাণ্ডুর পুত্রেরা যেমন সুবোধ সুশীল, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা দুর্বিনীত দুরাচার। শৈশব থেকেই ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্যোধন এবং তার কনিষ্ঠ দুঃশাসন হিংসাশ্রয়ী সর্বপ্রকার দোষের আকর, ভীষ্ম তাদের শাসন করেন, ভালো মন্দ বোধ জন্মানোর চেষ্টা করেন কিন্তু অন্ধ পিতা ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্রয়ে তারা আরও দুর্বিনীত হয়ে ওঠে। পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠপুত্র যুধিষ্ঠির ধর্মপরায়ণ, সৎ, সত্যবাদী। অনুজেরা তার অনুগামী, মধ্যমপুত্র ভীম অত্যন্ত বলশালী এবং কিছুটা রাগী প্রকৃতির হলেও ভীষ্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাঁর প্রতিটি বাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। পাণ্ডুর তৃতীয়পুত্র অর্জুন সুদর্শন, বীর, শান্ত, ধীর বুদ্ধিমান। এই অর্জুন ভীষ্মের সর্বাধিক প্রিয় আর স্নেহধন্য। নকুল সহদেব অত্যন্ত সরলমতি বালক।

ভীষ্ম এবার সত্যিই চিন্তিত দুর্বিনীত ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের জন্য। ওরা এই বয়সেই পাণ্ডু পুত্রদের সঙ্গে যে হিংসাশ্রয়ী আচরণ করছে ভবিষ্যতে তা সংঘাতের সৃষ্টি করবে। দুর্যোধন একদিন ষড়যন্ত্র করে ভীমকে বিষপান করিয়ে গঙ্গায় ফেলে দেয়। অচেতন ভীম ভাসতে ভাসতে নাগলোকে চলে যায়। সেখানে নাগের দংশনে তার শরীরের বিষক্ষয় হয়। চেতনা ফিরে পেয়ে নাগদের মারতে থাকে। অবশেষে বাসুকী তাকে চিনতে পেরে নাগলোকের অতিথি রূপে গ্রহণ করেন। অমৃত পান করান এবং দীর্ঘ বিশ্রামের পর মাতা এবং ভ্রাতাদের নিকট পাঠিয়ে দেন। দুর্যোধনের এই কীর্তি ভীষ্ম জানতে পারেন, তিনি ধৃতরাষ্ট্রের কাছে অভিযোগ করলে ধৃতরাষ্ট্র বলেন ছেলেমানুষ ক্রীড়াচ্ছলে হয়তো ভুল করেছে। এইভাবে ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্রয়ে দুর্যোধনের দৌরাত্ম্য দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ভীষ্ম অনেকদিন ধরে এই বালকদের জন্য একজন গুরুর সন্ধান করছিলেন। এবার বালকেরাই তাঁদের গুরুর সন্ধান নিজেরাই করল। এক দিন বালকেরা ক্রীড়ারত অবস্থায় একটি

লৌহভাটা অসাবধানতা বশত কূপে ফেলে দেয়। কিছুতেই সেই ভাটা তারা তুলতে পারছে না। ক্রীড়া বন্ধ হয়ে গেল। সবাই পড়ে বিরস বদনে। এই সময় ওই স্থান দিয়ে যাচ্ছিলেন এক শুক্লকেশ শুক্লবস্ত্র পরিহিত এক বলবান পুরুষ। তিনি বালকদের বিরস বদন দেখে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে তারা বলল তাদের ক্রীড়ার লৌহভাটা কূপে পড়ে গেছে, তাই তাদের ক্রীড়া বন্ধ, এই হেতু মনস্তাপ। এই বীরপুরুষ ভাটাটি লক্ষ্য করে এক মন্ত্রপুত ইষিকা নিক্ষেপ করেন। সেই ইষিকা লৌহভাটা বিদ্ধ করে। এবার পরপর অনেকগুলি ইষিকা নিক্ষেপ করেন সেই অজ্ঞাত পুরুষ। ইষিকাগুলি একের পর এক যুক্ত হয়ে দীর্ঘকায় হয়। এইবার ইষিকা ধরে টানলেন সেই বীর। এবার ভাটা উপরে উঠে এল। বালকরা অজ্ঞাত পরিচয় বীরের এই কীর্তি দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল। পিতামহ ভীষ্মের কাছে এই সংবাদ গেলে তিনি অনুসন্ধান করে জানলেন এই অজ্ঞাত পুরুষ ধনুর্বেদের শ্রেষ্ঠ গুরু দ্রোণাচার্য। ভীষ্ম তৎক্ষণাৎ সসম্মানে দ্রোণকে বালকদের অস্ত্রগুরু রূপে নিযুক্ত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে দ্রোণের আত্মীয় কৃপাচার্যকেও গুরু রূপে নিয়োগ করা হলো। দ্রোণের সঙ্গে এল তাঁর বালকপুত্র অশ্বত্থামা। পৌত্রদের অস্ত্রবিদ্যা লাভে নিশ্চিন্ত হলেন পিতামহ ভীষ্ম।

ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর পুত্রদের মধ্যে যুধিষ্ঠির বয়োজ্যেষ্ঠ। নীতিগতভাবে যুধিষ্ঠিরের যুবরাজ হওয়া উচিত। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র বারংবার বাধা সৃষ্টি করে চলেছে কোনো না কোনো অজুহাতে। এবার ভীষ্ম দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। শুভদিন শুভক্ষণে যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করা হলো। যুধিষ্ঠিরের অভিষেকে প্রজাকুল প্রীত হলো, শত্রুরা ভীত হলো। রাজাজ্ঞা পেয়ে ভীমার্জুন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হয়ে বহু দেশ জয় করলেন এবং বিপুল সম্পদ অধিকার করলেন। পাণ্ডু পুত্রদের শৌর্য, বিক্রম আর খ্যাতির আলোয় ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা সর্বদা অন্ধকারে। পাণ্ডুপুত্রদের যশ কীর্তি দিন দিন বাড়ছে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে তা অসহ্য। এই সময়ে একদিন ব্যাসদেব এলেন হস্তিনাপুর প্রাসাদে মাতৃসকাশে। জননীর কাছে ব্যাস বললেন,

—মাতা, ধর্মকাল গেল। তোমার বংশে এবার আরম্ভ হবে দুরাচার। ধৃতরাষ্ট্রের কপটতায় কুলক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। এই কুলক্ষয় দর্শনের পূর্বে গৃহ ত্যাগ করে তপোবনে চল। ভীষ্মকে বললেন।

—আরও কিছুকাল পৃথিবীতে থাকতে হবে। পূর্বজন্মে তুমি বসুগণের মধ্যে ছিলে দিব্যবসু। তুমি বশিষ্ঠের কামধেনু নন্দিনীকে হরণ করেছিলে। অন্যবসুরা অচিরে মুক্তি পেলেও কৃতকর্মের জন্য বশিষ্ঠের বিধান অনুযায়ী তোমার নরযোনি প্রাপ্তি এবং ভোগ এখনও শেষ হয়নি। অনেক অপ্রীতিকর, ভয়ঙ্কর ঘটনার সাক্ষী থাকতে হবে তোমাকে।

ব্যাসদেব অন্তর্ধান করলেন। সত্যবতী দুই বধূকে ডেকে ব্যাসদেব যা কিছু বলে গেছেন সব বললেন, এবং শোনালেন তিনি এবার বানপ্রস্থে যাবেন। বধূরা তাঁর অনুগামিনী হলেন অন্তঃপুরের সব বৃদ্ধারমনীরা তপোবনে চললেন রাজমাতা সত্যবতীর সঙ্গে। ভীষ্ম সবার যাত্রার ব্যবস্থা করলেন কিন্তু তাঁর কোথাও যাওয়া সম্ভব নয় তিনি কুরুকুলের রক্ষাকর্তা। এইসময়ে বিদুর আর এক মারাত্মক সংবাদ শোনালেন ভীষ্মকে। গ্রামে নগরে এখন সর্বত্র পঞ্চ পাণ্ডবের সুখ্যাতি। সবাই চাইছে যুধিষ্ঠির এবার রাজ সিংহাসনে বসুক। ভীম, অর্জুন রাজ্য রক্ষা করুক। এই সব কথা শুনে দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছে পাণ্ডুপুত্রদের রাজ্যের বাইরে না পাঠালে দুর্যোধন পিতৃসকাশে আত্মহত্যা করবে। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুপুত্রদের বারণাবত নগরে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন। আর দুর্যোধন তারা যে গৃহে অবস্থান করবে সেই গৃহকে জতুগৃহ বানিয়ে কুন্তী-সহ পাণ্ডুপুত্রদের পুড়িয়ে মারার ষড়যন্ত্র করেছে। সময়ে সতর্ক না হলে পাণ্ডুপুত্রদের রক্ষা করা যাবে না। কুন্তী-সহ পঞ্চপাণ্ডব যখন বারণাবতের উদ্দেশে যাত্রা করবেন তখন বিদুর যুধিষ্ঠিরের কানে এক আসন্ন বিপদের সংকেত দিলেন যাতে সেই বিদেশে তারা সদা সতর্ক থাকেন। ভীষ্ম, বিদুর পরামর্শ করে এক খনক পাঠালেন যাতে তাদের বাসগৃহ থেকে সুরঙ্গ তৈরি করে রাখে। বিপদ ঘটলে যাতে বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে। দুর্যোধনের কুচক্রী মন্ত্রী পুরোচন পাণ্ডবদের বাসের জন্য জতুগৃহ নির্মাণ করেছিল। সেই গৃহে বসবাসের সময় অকস্মাৎ একদিন সেই গৃহে আগুন লাগে। বিদুরের সংকেতমতো পাণ্ডবরা কুন্তী-সহ সেই সুড়ঙ্গপথে বেরিয়ে যায়। দৈবক্রমে সেইদিন রাতে পাঁচ সন্তান-সহ এক ভিখারিণী সেই জতুগৃহে আশ্রয় নিয়েছিল অগ্নিসংযোগে তাদের দেহ দগ্ধ হয়। সেই ছয় দগ্ধদেহ দেখে পুরবাসীরা ভাবে পঞ্চপুত্র-সহ কুন্তী দগ্ধ হয়েছেন। দূতমুখে হস্তিনার প্রাসাদে এই সংবাদ পৌঁছালে পাণ্ডবের অনুগামীরা শোকে মুহ্যমান হয়। ক্রূর দুর্যোধন পাণ্ডবদের নিধন সংবাদে নিশ্চিন্ত। ভীষ্ম জানতেন পাণ্ডবরা বেঁচে আছে। যদিও পাণ্ডবেরা এখন পরিণত যুবা। পৃথিবীর কোনো শক্তি নেই তাদের ক্ষতি করতে পারে। ওরা দেবতার সন্তান। তথাপি চিন্তা হয়। পিতৃহীন অনাথ শিশুদের যে তিনি পিতৃস্নেহে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছেন। কুরুরাজ্যে এখন দুর্যোধন হর্তাকর্তা। রাজা ধৃতরাষ্ট্র তার হাতের পুতুল। কর্ণ ও শকুনি তার দুষ্কর্মের নিত্য সহচর। কর্ণ বীর, কিন্তু দুর্যোধনের কাছে তার পৌরুষ বিক্রয় করে দিয়েছে। শকুনি ধূর্ত কুচক্রী, পিতা ভ্রাতার মৃত্যুর জন্য দায়ী দুর্যোধন এবং কুরুবংশের সে বিনাশ চায়। মূর্খ দুর্যোধন তার ছলনা বুঝতে পারে না। দুর্যোধনের দুই মিত্র ভীষ্মের চক্ষুশূল। কৌরবদের শতভাইয়ের মধ্যে বিকর্ণ স্বতন্ত্র। স্পষ্টভাষী, ন্যায়নিষ্ঠ, সরল সহোদরদের থেকেও পাণ্ডবদের প্রতি ছিল তার অধিক আনুগত্য, সখ্য। এই কারণে সে ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনের বিরাগভাজন। হস্তিনাপুরের প্রাসাদে এই নবীন যুবা ভীষ্মের অত্যন্ত প্রিয়, বিশ্বস্ত।

বহুকাল অতিবাহিত। ভীষ্ম-বিদুর সম্ভাব্য নানা স্থানে গুপ্তচর পাঠিয়েও পঞ্চপাণ্ডবের সন্ধান পেতে ব্যর্থ। এক সময়ে সংবাদ

পাওয়া গিয়েছিল একচক্রা নগরে এক ভীষণ রাক্ষস এক ব্রাহ্মণ কুমারের হস্তে নিহত হয়েছে। সেই ব্রাহ্মণ কুমারের সঙ্গে মধ্যম পাণ্ডব ভীমের সাদৃশ্য আছে। একচক্রা নগরে গুপ্তচর পাঠিয়েছিলেন ভীষ্ম। গুপ্তচর ফিরে এসে জানিয়েছিল পাঁচ সন্তান-সহ এক ব্রাহ্মণ রমণী একচক্রায় বাস করছিল কিন্তু সম্প্রতি তারা অন্যত্র চলে গেছে। সেই ব্রাহ্মণ রমণীর এক পুত্র সেই ভয়ংকর রাক্ষসকে বধ করেছে। পাণ্ডবরা যে বেঁচে আছে তা অনেকটা নিশ্চিত হওয়া গেল।

এই সময়ে পাঞ্চাল রাজার দূত পত্র দিয়ে গেল রাজকন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে সমস্ত রাজপুরুষের আমন্ত্রণ। এক অদ্ভুত কৌশলে স্থাপিত এক মৎস্যের চক্ষু ভেদ করতে পারলে পাঞ্চাল রাজকন্যা দ্রৌপদী সেই বিজয়ীর গলায় বরমাল্য পরাবেন। ভারতবর্ষে রাজা, মহারাজা, রাজপুত্রেরা উপস্থিত এই স্বয়ংবর সভায়। আছেন মৎস্যরাজ বিরাট, বিরাট শ্যালক কীচক, চেদিরাজ শিশুপাল, রুক্মী, ভগদত্ত, শল্য, শাল্ব, কাশীরাজ, কলিঙ্গরাজ, চন্দ্রসেন, মদ্রসেন, সত্যসেন, সুষেণ, দন্তবক্র। কিন্তু বাণ যোজনা দূরে থাক, তারা ধনুস উত্তোলনই করতে পারলেন না। অতিথি বর্গের আসার বিরাম নেই। আসছেন মগধরাজ জরাসন্ধ, কুরুবীর ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, দুর্যোধন, অঙ্গরাজ কর্ণ। সবাই উপবিষ্ট সুদৃশ্য চন্দ্রাতপের নীচে রত্নখচিত সিংহাসনে। হঠাৎ অন্তরীক্ষে পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদ হলো। শঙ্খধ্বনি শুনে বিচলিত হলেন ভীষ্ম। তাঁর দৃষ্টি যেন কাউকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এই সময়ে সামনে দেখা দিলেন বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে ভীষ্ম উঠে দাঁড়িয়ে প্রণিপাত করলেন। তাঁর সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন আচার্য দ্রোণ, আচার্য কৃপ, সত্যসেন, সত্রাজিৎ, শল্য ভুরিশ্রবা-সহ সহস্র নৃপতি। অন্যদিকে জরাসন্ধ, শিশুপাল, শাল্ব, রুক্মী, দন্তবক্র-সহ যত দুষ্টচক্র। তারা শ্রীকৃষ্ণকে দেখে পরিহাস করতে লাগল। শিশুপাল বলল,

—গোপাল ভালো শঙ্খ বাজায় তাই দ্রুপদ রাজা তাকে বাদ্যকরের দলে নিযুক্ত করেছে।

দুষ্টচক্র সোল্লাসে হেসে উঠল। জরাসন্ধ বলল—

—ভীষ্ম তুমি জ্ঞানবান, কিন্তু অজ্ঞানের মতো কাজ করলে কেন? গোপ-সুতকে প্রণাম কি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম? নন্দগোপের গৃহে লালিতপালিত, গোপ অন্ন খেয়ে, গোরু চরিয়ে বড়ো হয়েছে, একথা কে না জানে সব জেনে শুনেও তুমি এই কাজ কীভাবে করলে? এ সমস্ত ক্ষত্রিয় জাতির অপমান।

ভীষ্ম শান্তভাবে বললেন, এত তত্ত্ব আমি জানি না। তবে প্রাচীন ঋষি মুনি ও জ্ঞানীদের মুখে শুনেছি এই গোপালের চরিত্র বেদের অগোচর। তাঁর মহিমা ত্রিলোকে কে বর্ণনা করতে পারে? তিনি এক রোমকূপে ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করতে পারেন। তিনি এত বিরাট যে তাঁর নিশ্বাসে প্রলয় হতে পারে। সেই প্রভু এই গোপাল অবতার। যার নাভিকমল থেকে ব্রহ্মার সৃষ্টি, ললাট থেকে ধাতা, চক্ষু থেকে তপন, মন থেকে চন্দ্র, নিশ্বাস থেকে পবনের জন্ম। ব্রহ্মকীট থেকে যত নৃপতি সর্বত্র মায়ারূপে এই গোপাল বর্তমান। পঞ্চমুণ্ডে যাঁকে প্রণাম করছেন মহেশ, চতুর্মুখে ব্রহ্মা। সহস্র শিরে শেষনাগ, তার মধ্যে আমি এক নগণ্য মানুষ গোপালকে প্রণাম করে ধন্য হয়েছি।

—এ যদি দেব নারায়ণ হয়, তাহলে আমার ভয়ে সমুদ্রতীরে পালাল কেন? গোপালভক্ত ভীষ্ম জবাব দাও?

—পূর্বজন্মে তুমি ছিলে দৈত্যরাজ। কৃষ্ণের হাতে মৃত্যু হলে তুমি দিব্যগতি প্রাপ্ত হতে, তাই কৃষ্ণ সহস্তে তোমাকে বধ করেননি। বলরাম বধ করতে উদ্যত হয়েছিলেন, কিন্তু দৈববাণী শুনে তিনিও ক্ষান্ত হলেন।

এই বাক্য শুনে জরাসন্ধ ক্রোধে রক্ত আঁখি হলেন। ভীষ্ম তার দিকে তাকিয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন,

—কৃষ্ণনিন্দার স্থলে আমি থাকি না। নিন্দুককে বধ করি কিংবা সেই স্থান পরিত্যাগ করি। আমি অন্যত্র চললাম।

আবার লক্ষ্যভেদ শুরু। এলেন ভীষ্ম ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে বললেন—আমি ব্রহ্মচারী, দার পরিগ্রহ করবো না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমি যদি লক্ষ্যভেদ করতে পারি তাহলে এই কন্যারত্ন দুর্যোধনের হবে। এই কথা বলে তিনি যখন ধনুকে তির যোজনা করতে যাবেন তখন সম্মুখে শিখণ্ডীকে দেখতে পান। ভীষ্ম কোনো অমঙ্গল চিহ্ন দেখতে পেলে ধনুর্বাণ ত্যাগ করেন। এক্ষণেও তাই হলো।

অভ্যাগত নৃপতি ক্ষত্রিয়রা লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হলে ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্রাহ্মণদের মধ্যে যদি কেউ ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী থাকেন তবে তাঁকে আহ্বান করলেন। ব্রাহ্মণ সভায় যুধিষ্ঠিরের পাশে চার ভাই বসেছিলেন। যুধিষ্ঠিরের ইঙ্গিতে অর্জুন অগ্রসর হলেন লক্ষ্যভেদে। ধনুঃশর হাতে নিয়ে প্রথমে ইঙ্গিতে পাদবন্দনা করলেন পিতামহ ভীষ্মের, পরে গুরু দ্রোণের। ভীষ্ম দ্রোণ বুঝে গেলেন এ নিশ্চয়ই অর্জুন। অনায়াসে লক্ষ্যভেদ করে দ্রৌপদীর বরমাল্য গ্রহণ করলেন। ঈর্ষান্বিত নৃপতিকুল সমবেতভাবে অর্জুনকে আক্রমণ করল। ভীম এক দীর্ঘ বৃক্ষ উৎপাটিত করে প্রচণ্ড আক্রমণ করলেন ক্ষত্রিয়দের। অর্জুন ধনুর্বাণ সংগ্রহ করে জর্জরিত করতে লাগলেন রাজন্যবর্গকে। ভীষ্ম নিশ্চিন্ত এই নিশ্চয় ভীম অর্জুন। পরম প্রীত হলেন বৃদ্ধ পিতামহ। দুহাত তুলে আর্শীবাদ করলেন স্নেহভাজন তৃতীয় পাণ্ডবকে। চারপাশ থেকে রাজন্যবর্গ তীক্ষ্ণবাণ নিক্ষেপ করছে অর্জুনের উপর। অর্জুন হেলায় প্রতিহত করছে সেই বাণ। আর বাণে বাণে জর্জরিত করছে সেই রাজাদের। অন্যদিকে ভীম এক বিশাল বৃক্ষের আঘাতে রাজাদের রথ, অশ্ব, আর মস্তক চূর্ণ করছে। অল্প সময়ের মধ্যে রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করল রাজন্যবর্গ। দুর্যোধন সন্ত্রস্ত হয়ে ভীষ্ম, দ্রোণ, আর কর্ণকে নিয়ে হস্তিনার পথ ধরল।

শ্রীকৃষ্ণ সভা থেকে বিদায়ের সময় বিদুরকে পাণ্ডবদের কথা বললেন। তাঁরা জীবিত ও সুস্থ আছে এবং দ্রুপদকন্যার সঙ্গে তাদের বিবাহ হয়েছে। বিদুর ভীষ্মের সঙ্গে পরামর্শ করে

ধৃতরাষ্ট্রকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করান। ভীষ্ম পাণ্ডু পুত্রদের হস্তিনাপুরে এনে তাদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দেন। দুর্যোধন ও কর্ণ এই প্রস্তাবের প্রচণ্ড বিরোধিতা করলেও ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠতাত ভীষ্মের পরামর্শ মেনে পাণ্ডবদের হস্তিনায় ফিরিয়ে আনার জন্য বিদুরকে প্রেরণ করেন। পাণ্ডবেরা মাতা কুন্তী ও স্ত্রী দ্রৌপদী-সহ হস্তিনায় উপস্থিত হলে ভীষ্ম পাণ্ডবদের নিরাপত্তার জন্য খাণ্ডবপ্রস্থে প্রাসাদ নির্মাণ করে সেখানে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার জন্য দৃতরাষ্ট্রকে প্রস্তাব দেন। ধৃতরাষ্ট্র কর্ণ দুর্যোধনের বিরোধিতা সত্ত্বেও খাণ্ডবপ্রস্থে প্রাসাদ নির্মাণ করে পাণ্ডবদের বসবাস করার প্রস্তাবে সম্মত হন। ময়দানবের হস্তে নির্মাণ হলো ইন্দ্রপ্রস্থ নগরী। পঞ্চপাণ্ডব বাস করছে মনোরম ইন্দ্রপ্রস্থে। ভীষ্ম কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। কুটীল দুর্যোধন তাদের ক্ষতি করার জন্য সর্বদা উন্মুখ। কুচক্রী কর্ণ আর শকুনি, দুর্যোধনকে সর্বদা প্ররোচিত করছে। সুতপুত্রের বীরত্ব আছে, কিন্তু দুর্যোধনের অনুগৃহীত হওয়ার কারণে সতত তার অপকর্মের সাথী। আর শকুনি, পিতা আর ঊনশত ভায়ের হত্যার প্রতিশোধ নিতে কুরুবংশকে ধ্বংস করতে চায় না তো? নৃশংসভাবে মাতামহ আর একশত মাতুলকে হত্যার পরিকল্পনা করেছিল দুর্যোধন। দৈবক্রমে বেঁচে যায় কনিষ্ঠ শকুনি। জনশ্রুতি, পিতা আর ভ্রাতাদের বক্ষপঞ্জরে পাশা তৈরি করেছেন শকুনি। সেই পাশাতেই ধ্বংস করবে কুরুকুল।

পুত্রের সব অপকর্ম নীরবে সমর্থন করেন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র। ভীষ্ম প্রথমে প্রতিবাদ করতেন কিন্তু পিতা-পুত্র তা গ্রাহ্য করে না। অচিরে এই মহান বংশের বিনাশ ঘটাবে দুর্যোধন, ভীষ্মের কাছে তা দিবালোকের মতো স্পষ্ট। এবার ভীষ্ম ফিরে যেতে চান বসুলোকে দিব্যবসু হয়ে কিন্তু মহর্ষি ব্যাস বলেছেন তাঁর শাপ এখনো পরিপূর্ণ হয়নি। আরও কিছুকাল মর্ত্যলোকে তাঁকে অবস্থান করতে হবে।

এদিকে পাণ্ডবদের সঙ্গে অনেকদিন সাক্ষাৎ হয়নি, ভীষ্মের মনটা তাই উচাটন। তবে জনশ্রুতি, সুশাসন ও সৎকার্যের জন্য পাণ্ডবেরা প্রজাদের চোখের মণি। রাজ্যের সর্বত্র সুখ, সমৃদ্ধি আর শান্তির পরিবেশ। ভীম অর্জুনের দিগ্বিজয়ে সমৃদ্ধ কোষাগার। একদিন হস্তিনাপুর প্রাসাদের সামনে এসে থামল তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের রথ। রথ থেকে নেমে অর্জুন এগিয়ে গেলেন পিতামহ ভীষ্মের শয়ন কক্ষের দিকে। অর্জুনকে দেখে অত্যন্ত প্রীত হলেন পিতামহ। কুশলাদি বিনিময়ের পরে অর্জুন জানালেন যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করার মনস্থ করেছেন, পিতামহ অনুমতি দিলে তবে আয়োজন শুরু হবে। তাই যুধিষ্ঠিরের এবং ভ্রাতাদের প্রার্থনা পিতামহ যেন এই কতিপয় দিবস ইন্দ্রপ্রস্থ প্রাসাদে অবস্থান করে পাণ্ডবদের অনুগৃহীত করেন। হস্তিনাপুরের প্রাসাদ ভীষ্মের কাছে আর বাসযোগ্য মনে হচ্ছিল না, তিনিও অল্পদিনের জন্য মুক্ত নিঃশ্বাস নিতে চেয়েছিলেন। অর্জুন প্রাসাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের

সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করলেন, তারপর পিতামহ ভীষ্মকে সঙ্গে নিয়ে আবার ফিরে গেলেন ইন্দ্রপ্রস্থে। ভীষ্মের আগমনে ইন্দ্রপ্রস্থ প্রাসাদে আনন্দের লহরী বয়ে যাচ্ছে। পঞ্চভ্রাতা, মাতা কুন্তী, বধূ দ্রৌপদী প্রত্যেকেই পিতামহকে সন্তুষ্ট করার জন্য উদগ্রীব। মাতা কুন্তী বারবার সেইসব দিনের কথা, স্মরণ করছেন যখন সদ্য পিতৃহারা পাঁচ শিশুকে পিতামহ ভীষ্ম পিতৃস্নেহে দুর্যোধনের বিকৃত অত্যাচারের হাত থেকে বার বার রক্ষা করেছেন। যথোপযুক্ত শিক্ষাদান, সৎ পথে চলা, অসৎ সংসর্গ পরিত্যাগ, এসবই পিতামহ শৈশব থেকেই বুঝিয়েছেন। এনিয়ে ধৃতরাষ্ট্র কটাক্ষও করেছেন, পিতামহ পাণ্ডুর পুত্রদের পক্ষপাতী। গ্রাহ্য করেননি ভীষ্ম। স্নেহ ভালোবাসা উজাড় করে দিয়েছেন পিতৃহীন পাণ্ডুর সন্তানদের। ভীষ্মের নীতিকথা, সৎপথে চলার বার্তা দুর্যোধন দুঃশাসনরা শৈশব থেকে পছন্দ করত না, তারা সব সময় এড়িয়ে চলত এই নীতিবাগীশ বৃদ্ধকে। কৌরবদের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম বিকর্ণ, সত্যনিষ্ঠ, ন্যায়বান এই বালক সর্বদা পিতামহ ভীষ্মের অনুগামী। খুব ভালো কাটছে ইন্দ্রপ্রস্থে ভীষ্মের দিনগুলি। হঠাৎ সুর কাটল যখন পাঞ্চাল থেকে দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন অনেক উপঢৌকন সহ ক্লীব শিখণ্ডীকে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে এলেন। পাঞ্চালরা যুগ যুগ ধরে কুরুদের বিরোধী, অতীতে কুরুদের সঙ্গে পাঞ্চালদের বহু যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। কুরুদের অন্যতম শত্রু পাঞ্চালরা। আর শিখণ্ডী দ্রুপদ রাজের ক্লীব সন্তান, তাকে দেখলে ভীষ্মের মনে অনেক স্মৃতি জেগে ওঠে, ভীষ্মের তখন পরিপূর্ণ যৌবন। ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যের বিবাহের জন্য কাশী রাজের তিনকন্যা অম্বা, অম্বিকা, অম্বালিকাকে হরণ করছেন ভীষ্ম, অম্বিকা অম্বালিকা নিতান্ত বালিকা, কিন্তু অম্বা পরিপূর্ণা যৌবনা, তাকে হাত ধরে রথে তোলার সময় হয়তো ভীষ্মের হাত একটু কেঁপেছিল। হস্তিনাপুরে নিয়ে আসার পর ভীষ্ম যখন জানতে পারলেন যে অম্বা শাল্ব রাজের অনুরাগিনী, তখন তাকে মুক্তি দিয়ে সসম্মানে শাল্বরাজের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। শাল্বরাজের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে এল অম্বা। ভীষ্মের কারণে অম্বাকে প্রত্যাখ্যান করেছে শাল্ব। অম্বা তাই ভীষ্মের কাছে দাবি জানালো তাকে বিবাহ করার। রথে তোলার সময় ভীষ্ম হাত ধরেছে অম্বার তাই বিধিমতে তার পাণিগ্রহণ হয়েছে। ভীষ্মের হৃদয় কি একটুও কেঁপে ওঠেনি? প্রতিজ্ঞায় অনড় ভীষ্ম অম্বাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। অম্বা যখন স্বহস্তে অগ্নি কুণ্ড প্রজ্বলিত করে তাতে প্রবেশ করছে তখন ভীষ্ম নিবৃত্ত করতে পারতেন, তাঁর অন্তঃকরণ হয়তো তাই চেয়েছিল কিন্তু তিনি যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, অনড়। তাই চোখের সামনে অম্বার আত্মাহুতি তিনি দেখলেন। সত্যের কাছে পরাজিত হলেন মানবতা। অম্বাও হয়তো অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ভেবেছিল এই বুঝি ভীষ্ম তার হাত ধরে দূরে সরিয়ে আনবেন। বিনা অপরাধে তার মৃত্যুর সাক্ষী হবেন না ভীষ্ম। কিন্তু ভীষ্ম নির্বিকার, অম্বা তখন অন্তরের সমস্ত ক্ষোভ উগরে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করলো,

—পরের জন্মে তোমার (ভীষ্মের) মৃত্যুর কারণ হব আমি।

তারপর অগ্নির লেলিহান শিখা গ্রাস করল অম্বার লাবণ্যময় কোমল দেহ। এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে ভীষ্মের চোখে কি জল এসেছিল? একবারও কি মনে হয়েছিল, এই মৃত্যু আটকানো যেত?

এই সময়ে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে নিয়ে এলেন রাজসূয় যজ্ঞের প্রস্তুতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনার জন্য। তিনজন মিলে আলোচনায় রত হলেন। এই আলোচনার প্রধান বিষয় জরাসন্ধ। আর্যাবর্তের ছিয়াশি হাজার নৃপতি বন্দি জরাসন্ধের কারাগারে। তাঁদের উদ্ধার করতে না পারলে রাজসূয় যজ্ঞ বৃথা।

ভীষ্ম বললেন—

আমিও এই বিষয়ে একমত। জরাসন্ধের মতো পাপীর বিনাশের সময় সমাগত তোমরা এই বিষয়ে যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আলোচনা করে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর। তিনি তোমাদের সঠিক নির্দেশ দেবেন।

পরবর্তী কালে শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে এবং প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় জরাসন্ধ বন্দি নৃপতিদের মুক্তির পর রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন হয়েছিল। যজ্ঞ সমাপনান্তে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে দূর দূরান্ত থেকে আগত রাজন্যবর্গকে পূজা করার নির্দেশ দিলেন। যুধিষ্ঠির পিতামহকে জিজ্ঞাসা করলেন সর্বাগ্রে কোন রাজাকে পূজা করা কর্তব্য। উত্তরে ভীষ্ম বললেন, বৃষ্ণিবংশে বিষ্ণু অবতার যাঁকে ইন্দ্রাদি দেবগণ সর্বদা পূজা করেন সেই কৃষ্ণকে সর্বাগ্রে পূজা করা কর্তব্য। তখন কনিষ্ঠ পাণ্ডব সহদেব আনন্দিত হয়ে শ্রীমধুসূদনের চরণ পূজা করেন। হৃষ্টচিত্তে শ্রীকৃষ্ণ সেই পূজা গ্রহণ করেন।

এই সভায় উপস্থিত ছিল দম ঘোষের পুত্র শিশুপাল। কৃষ্ণের পূজা দেখে শিশুপাল ক্রুদ্ধ হয়ে ভীষ্মের প্রতি কটু কথা বলতে শুরু করে।

শিশুপাল বলে—ভীষ্ম এ তোমার কেমন বিচার। পৃথিবীর সমস্ত রাজা আজ ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত। এত রাজা থাকতে কেন তুমি গোয়ালা কৃষ্ণকে পাণ্ডবদের দিয়ে পূজা করালে? কোন রাজার পুত্র কৃষ্ণ, কেন সে পূজ্য? আজ এই সভার মধ্যে তার ব্যাখ্যা তোমায় দিতে হবে। যদি বয়োজ্যেষ্ঠ পূজ্য হন তবে দ্রুপদ ছিলেন। আচার্য যদি পূজ্য হন তবে দ্রোণ ছিলেন। রাজা যদি পূজ্য হয় দুর্যোধন ছিল। যোদ্ধা যদি পূজ্য হয় তবে কর্ণ ছিল। আরও শত শত বীর ছিল। অশ্বত্থামা, কৃপ, শল্য ভীষ্মক আদি যোদ্ধা ও নরপতি থাকতে কৃষ্ণ হলো তোমার কাছে পূজ্য? সমস্ত যোদ্ধা আর নৃপতিদের সাদরে আমন্ত্রণ করে এনে তুমি পাণ্ডবদের দিয়ে সবাইকে অপমান করালে। সমস্ত রাজন্যবর্গকে যজ্ঞানুষ্ঠানে ডেকে এনে যুধিষ্ঠির এভাবে অপমান করতে পারে না। সমস্ত কিছু তোমার প্ররোচনায় হয়েছে। কৃষ্ণ দুষ্ট, যুধিষ্ঠির দুষ্ট আর তুমি এই দুষ্ট চক্রের শিরোমণি। এই দুষ্টের সভায় আমি কদাচিৎ থাকবো না। আমি চললাম।

এই কথা বলে শিশুপাল সভাস্থল থেকে বেরিয়ে এলো। তার দেখাদেখি আরও কিছু নীচাশয় রাজা তার অনুসরণ করল। তখন যুধিষ্ঠির সিংহাসন থেকে উঠে এসে শিশুপালকে মধুর বচনে বললেন,

—হে চেদীরাজ, এ আপনার উচিত কাজ হচ্ছে না। আপনি এভাবে সভাস্থল থেকে রাজাদের তুলে নিয়ে যেতে পারেন না। এই সভায় আরও অনেক রাজা মহারাজারা উপস্থিত আছেন দেখুন কৃষ্ণ পূজা সম্পর্কে কারও কোনো অনুযোগ নেই। যজ্ঞস্থলে উপস্থিত মুনিঋষিরাও কৃষ্ণ পূজায় আনন্দিত। পিতামহ ভীষ্ম গোবিন্দের তত্ত্ব জানেন। তাই সর্বাগ্রে গোবিন্দের পূজা করে তাঁর মহত্ত্ব বিধান করেছেন।

ভীষ্ম বললেন—

—যুধিষ্ঠির, এই হীন শিশুপাল মান্যযোগ্য নয়। কৃষ্ণ পূজায় যে নিন্দা করে সেই পাষণ্ড কদাচ সম্মান প্রত্যাশা করতে পারে না। এই মূঢ় জানে না সংসারে যত কর্ম আছে গোবিন্দে সমর্পণ করলে সব সিদ্ধ হয়। তুমি এই অল্পবুদ্ধি শিশুপাল এবং তার সহযোগীদের যেতে দাও।

সহদেব এতক্ষণ নিশ্চুপ ছিলেন। বারম্বার কৃষ্ণনিন্দা শুনে এবার মুখ খুলে বললেন।

—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের যিনি কর্তা, সেই কৃষ্ণ ভগবানের পূজার নিন্দা যে মূঢ় পাপাত্মা করে আমি তার মস্তকে পদাঘাত করি।

শিশুপাল ও তার অনুগামীরা তখন সমবেত ভাবে 'যজ্ঞনাশ কর', 'কৃষ্ণকে মার', 'পাণ্ডবদের মার' প্রভৃতি ধ্বনি তুলে একযোগে যজ্ঞস্থল আক্রমণ করে। রাজা যুধিষ্ঠির যজ্ঞনাশের ভয়ে ভীষ্মের শরণ নিলেন। ভীষ্ম বললেন,

যুধিষ্ঠির, ভয় নেই বৎস। গোবিন্দের আরাধনা যে করে, এই ত্রিভুবনে তার কাকেও ভয় নেই। যে সব রাজারা আস্ফালন করছে যদুপতি তাদের শৃগালের ন্যায় দেখেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সবই দেখছেন। শিশুপালের বুদ্ধিতে যারা গর্জন করছে, তাদের যমালয়ে যাবার সময় সমাগত।

ভীষ্মের বাক্যে শিশুপাল আরও উত্তেজিত হয়ে ভীষ্মের প্রতি অপমানসূচক কটু বাক্য প্রয়োগ করতে থাকে। পিতামহ ভীষ্মের প্রতি শিশুপালের অপমানসূচক বাক্যে কুপিত হয়ে ভীম শিশুপালকে আক্রমণ করতে উদ্যোত হলে ভীষ্ম তাকে বলপূর্বক নিবৃত্ত করেন। ভীষ্ম ভীম-সহ সভাস্থ সবাইকে শিশুপালের অদ্ভুত জন্ম বৃত্তান্ত শ্রবণ করালেন। দম ঘোষের স্ত্রী শিশুপালের জননী বসুদেবের ভগ্নী, কৃষ্ণের মাতৃস্বসা। শিশুপাল চার হস্ত ও ত্রিনয়ন নিয়ে জন্মেছিল। এই বিপরীত লক্ষণ দেখে আত্মীয়েরা বিচলিত হয়। এই সময় এক দানবীয় আকাশবাণী শোনা যায়।

''এই শিশুকে দেখে বিচলিত হয়ো না। এই শিশু শ্রীমন্ত ও বলিষ্ঠ হবে। এর দুই হস্ত এবং এক চক্ষু যার স্পর্শে স্খলিত হবে তার হাতে এই বালকের মৃত্যু হবে।'' শৈশবে একদিন কৃষ্ণ বলরাম পিতৃস্বসার আলয়ে উপস্থিত হলে শিশুপালকে কৃষ্ণের কোলে দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে তার দুই হাত খসে যায় এবং তৃতীয় নয়ন অদৃশ্য হয়। বিপদ বুঝে পিতৃস্বসা কৃষ্ণের কাছে আবেদন করেন এই পুত্রের শত অপরাধ তিনি যেন ক্ষমা করে দেন। সেই শত অপরাধ পূর্ণ হলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এই পাপীষ্ঠকে বধ করবেন। এই কথা শুনে শিশুপাল আরও ক্রুদ্ধ হয়ে ভীষ্ম-সহ কৃষ্ণ ও পাণ্ডবদের উদ্দেশে কটুবাক্য প্রয়োগ করতে থাকে। অন্যান্য রাজাদের এক যোগে ভীষ্ম, কৃষ্ণ ও পাণ্ডবদের আক্রমণ করার জন্য প্ররোচিত করতে থাকে। এইবার কৃষ্ণের প্রতি শিশুপালের শত অপরাধ পূর্ণ হয়ে একটি বেশি হয়ে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন চক্রকে আহ্বান করলেন। অগ্নিসম মহাতেজে সুদর্শন শিশুপালের মস্তক ছেদন করে। শিশুপালের দেহ থেকে নির্গত তেজ গোবিন্দের পাদপদ্মে বিলীন হলো। উপস্থিত নৃপতিগণের কৃষ্ণ পাণ্ডবের জয়ধ্বনিতে সভামণ্ডপ মুখরিত হলো। রাজন্যবর্গ সমবেতভাবে যুধিষ্ঠিরকে রাজাধিরাজ ঘোষণা করলেন। যজ্ঞ সম্পূর্ণ এবং কার্য সিদ্ধি হলে রাজাগণ ভীষ্ম, শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে স্বদেশের উদ্দেশে যাত্রা করেন। পাণ্ডবেরা এই রাজন্যবর্গকে নানা উপহারে পরিতুষ্ট করেন। এবার ভীষ্মও বিদায় নিয়ে কৌরবদের সঙ্গে হস্তিনার পথে যাত্রা করলেন।

* * * *

এক রথে চলেছেন দুর্যোধন ও শকুনি। আজ দুর্যোধন নীরব ভারাক্রান্ত। শকুনি তার নীরবতার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। দুর্যোধন বললেন, পাণ্ডবদের ধন-ঐশ্বর্য, রাজ্যের বিস্তার, প্রজার আনুগত্য বিশাল সেনাবাহিনী এসব দেখে তাঁর মনের অবস্থা ভালো নেই। এখন তাঁর একমাত্র চিন্তা কী করে পাণ্ডবদের এই বিপুল ধন সম্পদ হস্তগত করা যায়? পাণ্ডবদের ইন্দ্রপ্রস্তের সঙ্গে হস্তিনার তুলনা হয় না। পাণ্ডবদের সবকিছু আমার চাই। শকুনি বলল অত সহজ নয়। কুরুদের চিরশত্রু পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ তার পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবদের সহায় আর যাদুবিদ্যায় পারদর্শী কৃষ্ণ সবসময় পাণ্ডবদের রক্ষা করছে। তাছাড়া পাণ্ডবরা দৈবশক্তিতে বলীয়ান। এই সব নৈরাশ্যজনক কথা দুর্যোধনের মনঃপুত হলো না। সে শকুনিকে ভর্ৎসনা করল। শকুনি বলল,

তোমার যুদ্ধ জয়ের দুই প্রবল অন্তরায় তোমার প্রাসাদে তোমার পিতামহ ভীষ্ম ও পিতৃব্য বিদুর, এঁরা তোমার জন্মশত্রু।

এই কথাটি দুর্যোধনের মনের কথা। দুর্যোধনের ইচ্ছা, আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রবল অন্তরায় এই দুই বৃদ্ধ। পিতাও সব সময় এদের বাক্য উপেক্ষা করতে পারেন না। দুর্যোধন বলে,

—তাহলে উপায় কী? পাণ্ডবদের যথাসর্বস্ব আমার চাই, যেভাবেই হোক।

শকুনি বলল,

—অবশ্য একটা পথ আমার জানা আছে। সে পথে সহজে তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হতে পারে।

—কী সেই পথ?

উৎকণ্ঠিত দুর্যোধন জিজ্ঞাসা করল,

—পাশাখেলা। যুধিষ্ঠিরের পাশাখেলায় আগ্রহ কিন্তু খেলায় পটু নয়। আমি অনায়াসে তাকে হারাতে পারব। বিনা যুদ্ধে শুধুমাত্র পাশার দানে তুমি পাণ্ডবের যথাসর্বস্ব জিতে নিতে পার। তুমি তোমার পিতাকে দিয়ে যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলায় আহ্বান কর। ক্ষত্রিয় মাত্র যুদ্ধ ও পাশাখেলার আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করে না। তবে তোমার পিতামহ ও পিতৃব্যের থেকে সাবধান।

দুর্যোধন পিতার কাছে প্রার্থনা করলেন যুধিষ্ঠিরকে পাশাখেলায় আমন্ত্রণ করার জন্য। ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের সঙ্গে পরামর্শ না করে এই সিদ্ধান্তে রাজি হলেন না। অবশেষে দুর্যোধন হঠকারিতার আশ্রয় নিয়ে পিতাকে রাজি করালেন। হস্তিনার দূত গেল ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের কাছে পাশা খেলায় অংশ গ্রহণের আমন্ত্রণপত্র নিয়ে। আমন্ত্রণপত্র গ্রহণ করে সম্মতি দিলেন যুধিষ্ঠির, সৌজন্য রক্ষা করলেন।

সেদিন অপরাহ্নে আপন কক্ষে ভীষ্ম বিশ্রামরত। ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে ফিরে আসার পর তার মনে শান্তি নেই। পাণ্ডবদের অপার ঐশ্বর্য, যশ, খ্যাতি বৈভব দেখে দুর্যোধনের লোভী চোখ দুটো জ্বলতে দেখেছেন তিনি। এবার সে যেকোনো সময়ে প্রচণ্ড আক্রোশে ছোবল মারবে। হয়তো যুদ্ধবিগ্রহ লাগাবার চেষ্টা করবে। এক অনিবার্য মহারণের ছবি ভীষ্মের মানসপটে মাঝে মাঝে ভেসে উঠছে।

এমন সময় এলেন বিদুর, তার সহাস মুখে আজ চিন্তার রেখা। তাঁকে আসন গ্রহণ করতে বললেন ভীষ্ম। বিদুরের মুখে কথা নেই। ভীষ্ম বললেন,

—বিদুর তোমাকে আজ এত বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন?

—পিতৃব্য, আমি এক ভয়ংকর বিপদের আভাষ পাচ্ছি আর তাই আপনাকে জ্ঞাত করাতে এসেছি। দুষ্ট দুর্যোধন আর কুটিল শকুনির প্ররোচনায় রাজা ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে পাশাখেলায় আমন্ত্রণ করেছেন। সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে যুধিষ্ঠির চার ভ্রাতা-সহ হস্তিনাপুরে আসছে। বাজি রেখে খেলা হবে। আপনি নিশ্চয় জ্ঞাত আছেন শকুনি কপট পাশাখেলায় সিদ্ধহস্ত। কপট পাশাখেলায় যুধিষ্ঠিরকে সর্বস্বান্ত করার জন্য দুর্যোধন ও শকুনির গোপন চক্রান্ত। রাজা আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দুর্যোধনের বাধায় তা সম্ভব হয়নি। এক্ষণে আমাদের কী করণীয় আপনি আমাকে জ্ঞাত করান।

কিছুক্ষণ নিরুত্তর, গম্ভীর থেকে ভীষ্ম বললেন,

—বিদুর, আমি কিছুদিন যাবৎ এক ভয়ংকর আশঙ্কা করছি। এই মহান কুরুবংশে দুরাচারী দুর্যোধন এক মহাবিপদকে আহ্বান করছে। হয়তো এই পাশাখেলা তারই সূচনা। সম্প্রতি দেবর্ষি নারদ রাজসভায় বলে গেছেন আজ থেকে চোদ্দ বছর পর এক ভয়ংকর যুদ্ধে এই বংশ ধ্বংস হবে। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র পুত্রস্নেহে অন্ধ হয়ে ক্রমশ এই বংশকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। যে ধৃতরাষ্ট্র তোমার পরামর্শ আর আমার সম্মতি ছাড়া কোনো সামান্য সিদ্ধান্তও নিত না, আজ তোমাকে, আমাকে উপেক্ষা করে কেবলমাত্র দুর্যোধনের প্ররোচনায় অনেক বড়ো সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলছে। একবারও ভাবছে না এই সিদ্ধান্ত একদিন কুরুবংশের সর্বনাশ ডেকে আনবে। বিদুর বললেন,

—পিতৃব্য, এই সর্বনাশা পাশা খেলা আমরা বন্ধ করার জন্য কোনো উদ্যোগ কি আমরা নিতে পারি না।

—যদি তুমি কোনো উদ্যোগ নাও, আমি সর্বতোভাবে তোমাকে সাহায্য করবো। তবে তুমি পারবে না, কারণ আমাদের কথা কেউ শুনবে না।

কোনো সমাধান সূত্র না পেয়ে বিদুর চলে গেলেন তাঁর কুটিরে। এইসময় সংবাদ এল মহারাজ তাঁকে শরণ করেছেন। বিদুর গেলেন মহারাজের কাছে। মহারাজ তাঁকে পাঠাবেন ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরকে হস্তিনায় আনার জন্য। উদ্দেশ্য পাশাখেলা।

পূর্বেই দূত পত্র নিয়ে গেছে এবং যুধিষ্ঠির পাশা খেলতে সম্মত হয়েছেন। এবার বিদুরকে পাঠানোর উদ্দেশ্য হলো বিদুর গেলে যুধিষ্ঠিরকে আসতেই হবে। বিদুরকে কিছুতেই ফেরাবেন না যুধিষ্ঠির। এই চক্রান্ত দুর্যোধন, শকুনি ও কর্ণের। শিকার কিছুতেই হাত ছাড়া করবে না তারা। সব বুঝেও রাজি হলেন বিদুর। ইন্দ্রপ্রস্থে যাওয়ার আগে আরেকবার সাক্ষাৎ করলেন ভীষ্মের সঙ্গে। সব শুনে ভীষ্ম বললেন,

—এই একটা শেষ সুযোগ, তুমি ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়ে যুধিষ্ঠিরকে নানা যুক্তি দিয়ে হস্তিনায় আসা বন্ধ করার চেষ্টা কর।

বিদুর গেলেন ইন্দ্রপ্রস্থে। যুধিষ্ঠির-সহ পাঁচভাই তাঁকে যথাযোগ্য সম্মান দেখালেন। বিদুর কুন্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যুধিষ্ঠিরকে আসার কারণ জানালেন, বললেন,

—হস্তিনাপুরীর নতুন প্রাসাদে দুর্যোধন এক দ্যূতক্রীড়ার আয়োজন। তোমাকে আমন্ত্রণ করে ইতিপূর্বে দূতও পাঠিয়েছে। এখন আমাকে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাঠালেন তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে।

যুধিষ্ঠির বললেন,

—এই দ্যূতক্রীড়া সর্বনাশের মূল। অজ্ঞানী ব্যক্তিরা এই ক্রীড়ায় আসক্ত হয়। যাই হোক এখন তুমি বল আমার করণীয় কী?

বিদুর আশান্বিত হয়ে বললেন,

—এই দ্যূত অনর্থের মূল। সর্বনাশের প্রবেশ দ্বার। এই ক্রীড়ায় কুলভ্রষ্ট হয়। আসক্তের সর্বনাশ হয়। আমি অন্ধরাজাকে নিবৃত্ত করার অনেক চেষ্টা করেছি। আমাকেই পাঠাল তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তুমি সর্বজ্ঞ এখন তুমি সিদ্ধান্ত নাও যাবে কী যাবে না? যা তুমি মঙ্গলজনক মনে করবে তাই কর। আমি এসেছি বলে তোমাকে যেতে হবে তেমন বাধ্য বাধকতা আছে বলে আমার মনে হয় না।

যুধিষ্ঠির বললেন,

—কুরু কুলপতির আজ্ঞা আমি লঙ্ঘন করি কী ভাবে? গুরু আজ্ঞা ভঙ্গ করলে নরকে বাস। পিতৃব্য ক্ষত্রিয়ের ধর্ম আপনি সবিশেষ অবগত। দ্যূত কিংবা যুদ্ধের আহ্বান ক্ষত্রিয়ের ফেরাতে নেই। আর আমিও কখনো ফেরাই না। অতএব আমরা পাঁচ ভাই আপনার সঙ্গে যাবো।

ভীষ্ম বিদুরের শেষ প্রচেষ্টা বিফল হলো। বিদুরের সঙ্গে পাঁচ ভাই চললেন হস্তিনার পথে ভারত ইতিহাসের এক অন্ধকার অধ্যায়ের সূচনা করতে।

হস্তিনার নব নির্মিত প্রাসাদে চলছে দ্যূতক্রীড়া। একপক্ষে শকুনি সঙ্গে দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ; অন্যপক্ষে যুধিষ্ঠির, সঙ্গে ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব। ক্রীড়া শুরু হলো। যুধিষ্ঠির পণ রাখছিলেন। এই কপট পাশাখেলায় তিনি এক এক করে সব হারালেন। রাজ্য গেল, সম্পদ গেল, হস্তি, অশ্ব, গাভী সব গেল। এরপরে পণ রাখলেন নিজেকে ও চার ভাইকে। এবারও হার হলো। সর্বশেষ পণ রাখলেন ধর্মপত্নী দ্রৌপদীকে। কপট পাশায় শকুনি শেষ বাজিও জিতে নিল। কুচক্রী দুর্যোধনের বান্ধবেরা হলো উল্লাসিত। দ্রৌপদীকে সভায় আনা হলো। দুর্যোধনের আদেশে দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণে উদ্যত হলো। লজ্জা নিবারণের শেষ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণের শরণ নিলেন। বিপদভঞ্জন শ্রীমধুসূদনের কৃপায় দ্রৌপদীর বস্ত্র হলো অফুরন্ত। বস্ত্র টানতে টানতে ক্লান্ত দুর্যোধন শেষ পর্যন্ত ক্ষান্ত হলো। মহাক্রোধে ভীষ্মের সর্বশরীর কাঁপতে লাগল। হুংকার দিয়ে ভীম প্রতিজ্ঞা করলো গদাঘাতে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করবেন এবং দুঃশাসনের বুকের রক্ত পান করবে। ভীষ্ম এবার বজ্রগম্ভীর স্বরে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন,

—অন্ধ রাজন। পুত্রস্নেহে অন্ধ হয়ে তুমি কুলাঙ্গার দুর্যোধনের সব আবদার মানতে গিয়ে কুরুবংশের সর্বনাশ ডেকে আনছ। এখনও সময় আছে সাবধান হও। ভীষ্মের ক্রোধ আর বীরত্বের কথা ধৃতরাষ্ট্র জানতেন। ভীষ্ম ইচ্ছা করলে মুহূর্তের মধ্যে কুরুবংশ ধ্বংস করতে পারেন। ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রপ্রস্থ সহ পাণ্ডবদের সব অধিকৃত সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের এই পদক্ষেপে প্রীত হলেন ভীষ্ম বিদুর-সহ পাণ্ডবদের হিতাকাঙ্ক্ষীরা। কুচক্রী মন্ত্রীদের পরামর্শে দুর্যোধন আবার দ্যূতে আহ্বান করলো যুধিষ্ঠিরকে ক্ষাত্রধর্ম পালনের অজুহাতে। যুধিষ্ঠির আবার সম্মত হলেন। এবার নতুন বাজি, হারলে বারো বছরের বনবাস, এক বছর অজ্ঞাতবাস। অজ্ঞাতবাসে পরিচয় প্রকাশ পেলে পুনরায় বারো বছরের বনবাস। শকুনির আবার কপট চাল, আবার হার যুধিষ্ঠিরের।

নগরবাসীদের অশ্রুজলে ভাসিয়ে পঞ্চপাণ্ডবের বনবাস যাত্রা। অনুগামী অনেক নগরবাসী। ভীষ্ম ধনুকে অগ্নিবাণ সংযোগ করে ভাবলেন দুর্যোধন আর তার কপট, কুটিল, পাপাত্মা মন্ত্রীগণ সহ এই পাপপুরী হস্তিনাপুরকে ভস্ম করবেন। পরক্ষণেই ভাবলেন শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত পাণ্ডবদের এটাই হয়তো ভবিতব্য। মনে পড়ল দেবর্ষি নারদের সেই অমোঘ ভবিষ্যদ্‌বাণী, আরও চোদ্দ বছর পর হবে সেই মহাযুদ্ধ। মহান কুরুবংশ রক্ষার যে গুরুদায়িত্ব তিনি একদিন স্বেচ্ছায় নিয়েছিলেন সে দায়িত্ব তাঁকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পালন করতে হবে। ধর্ম পালনের জন্য সমস্ত অপমান, অবহেলা, গ্লানি সহ্য করেও তাঁকে হয়ে থাকতে হবে কুরুকুলের রক্ষক, অন্যথায় তাঁকে সত্যভ্রষ্ট হতে হবে। ব্যাসের বচনে তাঁর প্রতি বশিষ্ঠের অভিশাপ অন্ত হতে আরও কিছু সময় বাকি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করলেন ভীষ্ম, তাঁর বিক্ষিপ্ত মন শান্ত হলো। আবার বিদুরের গৃহে পাণ্ডবজননী কুন্তীকে সান্ত্বনা দিলেন।

* * * *

বনবাস জীবনে একের পর এক বৎসর অতিবাহিত করছেন পাণ্ডবেরা। রাজ্যহারা, সর্বহারা পাণ্ডবরা। একবার দশ সহস্র শিষ্য সহ দুর্বাসা দুর্যোধনের চক্রান্তে কাম্যকবনে গিয়ে পাণ্ডবদের আতিথ্য গ্রহণ করেন। বেলা দ্বিপ্রহর, দ্রৌপদীরও ভোজন শেষ। সূর্যের বরে দ্রৌপদীর আহারের পূর্ব পর্যন্ত অক্ষয়ভাণ্ডে যত প্রয়োজন আহার পাওয়া যাবে। দশ সহস্র শিষ্য-সহ দুর্বাসা মুনির আহার্য কোথায় পাওয়া যাবে? সেবার শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উপস্থিত হয়ে সেই বিপদ থেকে পাণ্ডবদের উদ্ধার করেছিলেন।

ঘোষ যাত্রা উপলক্ষ্যে প্রভাস স্থানে চলেছেন সপরিবার সপার্ষদ দুর্যোধন। কাম্যক বনের কাছে গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনের প্রমোদ উদ্যান, দুর্যোধনের অনুচরেরা সেই উদ্যানে তাণ্ডব চালালে চিত্রসেন সসৈন্যে কৌরবদের আক্রমণ করেন এবং বন্দি করেন। শকুনি ও কর্ণ পালিয়ে যায়, অনেক সৈন্য নিহত হয়। বন্দি হয় দুর্যোধন সহ কৌরব কুলবধূরা। সংবাদ পেয়ে যুধিষ্ঠির ভীমকে প্রেরণ করলেন কৌরব কুলবধূদের উদ্ধার করতে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও জ্যেষ্ঠের আদেশে ভীম গন্ধর্ব সৈন্যদের ছত্রভঙ্গ করে উদ্ধার করেন দুর্যোধন-সহ কুরু রমণীদের। মুক্ত হয়ে দুর্যোধন প্রতিদান দিতে দেরি করল না। ভগ্নীপতি জয়দ্রথকে পাঠাল সুযোগ বুঝে পাণ্ডবদের অনুপস্থিতিতে কুটির থেকে দ্রৌপদীকে অপহরণ করতে। কিন্তু ভীমের হাতে ধরা পড়ে গেল জয়দ্রথ। ভীমের প্রহারে জর্জরিত হয়ে প্রাণ সংশয় হলো তার। অবশেষে দ্রৌপদীর করুণায় ভীম তাকে প্রাণভিক্ষা দিল।

ভীষ্ম প্রাসাদের নিভৃত কক্ষে বসে বিদুরের কাছে এইসব সংবাদ পান। আপন কক্ষ থেকে বাইরে যান না ভীষ্ম। রাজসভায় তো নয়ই। এদিকে পাণ্ডবদের বনবাসের দ্বাদশবর্ষ অতিক্রান্ত হয়েছে, এবার তাদের অজ্ঞাতবাস শুরু। অত্যন্ত সাবধানে এবার তাদের থাকতে হবে। দুর্যোধনের গুপ্তচর সর্বত্র ঘুরছে, একবার ধরা পড়লে আবার দ্বাদশ বর্ষ বনবাস। এই সময়ে একদিন বিদুর এলেন ভীষ্মের কক্ষে, শোনালেন এক অত্যন্ত গোপন সংবাদ। পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীসহ ছদ্মবেশ ধারণ করে অবস্থান করছে মৎস্যরাজ্যে বিরাটের প্রাসাদে। অর্জুন একসময়ে ইন্দ্রের প্রাসাদে অবস্থানের সময়ে অপ্সরা উর্বশীর দ্বারা এক বছরের জন্য

ক্লীবত্বের অভিশাপ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অজুর্নের প্রার্থনায় উর্বশী সেই অভিশাপ প্রয়োজনের সময় কার্যকর হবার প্রতিশ্রুতি দেন। অর্জুন এই অজ্ঞাতবাসে এক বৎসরের জন্য ক্লীবত্ব গ্রহণ করে বিরাট রাজকন্যার নৃত্যশিক্ষকের দায়িত্ব নিয়েছেন।

এই সংবাদে ভীষ্মের উৎকণ্ঠার অবসান হলো। পাণ্ডবদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হলেন তিনি। আর মাত্র কয়েকটা মাস, তারপর মুক্ত হবে তাঁর প্রিয় পাণ্ডুপুত্রেরা। কতদিন পরে তিনি দেখবেন তাঁর প্রিয় ধনঞ্জয়কে। শৈশব থেকে ভীস্মের বড়ো প্রিয় ধনঞ্জয়। পিতৃহীন পাণ্ডুতনয়েরা সবাই ভীষ্মের প্রিয় কিন্তু ধনঞ্জয়ের প্রতি ভীষ্মের পক্ষপাতটা সব সময় বেশি। ভীষ্মের ধনুক নিয়ে সব সময় টানাটানি করত ধনঞ্জয়। তাই কর্মকারকে দিয়ে ছোটো একটা ধনুক আর ছোটো ছোটো তির তৈরি করিয়ে দিতে হয়েছিল। সেই শৈশবেই ধনঞ্জয়ের লক্ষ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে যেতেন ভীষ্ম। দুই হাতেই সমান চলে এই শিশুর, তাই নাম সব্যসাচী। অত্যন্ত গোঁয়ার ভীম, ভীষ্মের কাছে সে ছিল এক সুবোধ বালক। সরলমতি নকুল- সহদেব, ভীষ্মকেই তারা পিতা মনে করতো। যুধিষ্ঠির ছিল ভীষ্মের ছায়াসঙ্গী। সেই বালকেরা এখন যুবক। সকলেই বীর, আত্মরক্ষায় সক্ষম, তথাপি এতদিন তাদের জন্য ভীষ্মের চিত্ত অস্থির ছিল। আজ বিদুরের কাছে এই শুভসংবাদ পাওয়ার পর ভীষ্ম নিশ্চিন্ত। আর মাত্র কয়েকটা মাস দেখতে দেখতেই কেটে যাবে। ভীষ্ম অঙ্ক কষে দেখছেন পাণ্ডবদের মুক্তির আর কতদিন বাকি। অতি দ্রুত কেটে যাচ্ছে দিনগুলি, ক্রমশ এগিয়ে আসছে পাণ্ডবদের মুক্তির দিন। এই সময়ে একদিন ভীষ্মের কক্ষে সঞ্জয়ের সাহায্য নিয়ে এলেন ধৃতরাষ্ট্র। একটু অবাক হয়ে গেলেন পিতামহ ভীষ্ম। এমন কী প্রয়োজন থাকতে পারে যার জন্য স্বয়ং রাজা ধৃতরাষ্ট্র চলে এলেন ভীষ্মের কক্ষে। আসন গ্রহণ করার পর ধৃতরাষ্ট্র ব্যক্ত করলেন তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য। বললেন, পিতৃব্য, অনেকদিন আপনি রাজসভার দরবারে যাননি, অবশ্য ভ্রাতা বিদুরের কাছে আপনার কুশল সংবাদাদি পাই। আজ একটা বিশেষ মন্ত্রণার জন্য আপনার কাছে এসেছি। দীর্ঘদিন রাজ্যে কোনো যুদ্ধবিগ্রহ হয়নি। সৈন্যরা ক্রমে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাচ্ছে। আক্রমণ করার মতো কোনো রাজ্য এই মুহূর্তে উপযুক্ত নয়। তবে সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গেছে বিরাট রাজার শ্যালক কীচক এক গন্ধর্বের হস্তে নিহত হয়েছে। বিরাটের শ্যালক ও সেনাপতি কীচক ছিল মহাবলী, অপরাজেয়, তার মৃত্যুতে মৎস্যরাজ্য অরক্ষিত। মৎস্যরাজের গোশালা আর্যাবর্তে বিখ্যাত। ষাট লক্ষ গাভী যে কোনো রাজার পক্ষে ঈর্ষার বস্তু। আপনি অনুমতি করলে কুরুসৈন্য বিরাট রাজ্য আক্রমণ করে গোধন হরণ করতে পারে। অবশ্যই এই অভিযানে আপনাকে সৈন্যাপত্য করতে হবে।

ভীষ্ম বললেন,

—এই পরিকল্পনা নিশ্চয়ই তোমার কুলাঙ্গার পুত্র দুর্যোধনের?

—হ্যাঁ, দুর্যোধন এই প্রস্তাবটি করেছিল ঠিকই কিন্তু আমারও তাতে সম্মতি ছিল। কারণ মৎস্যরাজ্যের বিশাল গোধন হস্তিনার গোশালায় এলে আমাদের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে।

প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হলেন পিতামহ ভীষ্ম। বললেন,

—তোমাদের পিতা-পুত্রের ষড়যন্ত্রে অবশেষে আমাকে গো-তস্করিতে নিয়োজিত হতে হবে?

—মার্জনা করবেন পিতৃব্য। আপনাকে অপমান করা আমাদের অভিপ্রেত নয়। গোধন হরণ ভারতীয় পরম্পরা।

কী যেন ভাবলেন ভীষ্ম পরমুহূর্তে সম্মতি জানালেন এই অভিযানে নেতৃত্ব দেওয়ার।

পূর্ব পরিকল্পনা ছিল দুর্যোধনের। দক্ষিণের গোশালা আক্রমণের দায়িত্ব দিয়েছিল অনুগত নৃপতি সুশর্ম্মার উপর। আর সমৃদ্ধ উত্তর গোশালা লুণ্ঠনের ভার বিভিন্ন সেনাপতিদের অধীনে কুরু সৈন্যদের উপর, সর্বোপরি পিতামহ ভীষ্ম। পিতামহ এই গো-তস্করদের সর্বাধিনায়ক হবেন দুর্যোধন তা ভাবতেও পারেনি। ধৃতরাষ্ট্রের প্রস্তাব শুনে প্রথমে সামান্য উষ্মা প্রকাশ করলেও পরে কী ভেবে তিনি সহজে রাজি হয়ে যান। দুর্যোধনের আদেশে সুশর্ম্মা দক্ষিণ গোশালা আক্রমণ করল। বিরাট সসৈন্যে প্রতি আক্রমণ করে পরাজিত ও বন্দি হলেন সুশর্ম্মার হাতে। দক্ষিণ গোশালার সমস্ত গাভী সুশর্মার অধিকারে।

এদিকে ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা, কর্ণ, দুঃশাসনের নেতৃত্বে কুরুসেনা বিরাটের উত্তর গোশালা আক্রমণ করল। গোশালার রক্ষক গোপেরা অনেকে বাধা দিয়ে নিহত হলো। বাকিরা বিরাটের প্রাসাদে গিয়ে এই গোধন হরণের বার্তা জানিয়ে এল। ষাট লক্ষ গোধন তাড়না করে তখন কুরুসৈন্যরা হস্তিনার পথে অগ্রসর হলো। বিরাটের প্রাসাদে তখন যোদ্ধা বলতে একমাত্র বিরাটপুত্র উত্তর। সৈন্য নেই, সারথি নেই, অস্ত্র নেই। এই পরিস্থিতিতে সৌরিন্ধ্রী দ্রৌপদী ভাবলেন মৎস্যরাজ বিরাট আমাদের বিপদে আশ্রয়দাতা আজ তাঁর রাজ্য বিপন্ন, আমাদের উচিত তাঁর সম্পদ রক্ষা করা। তিনি বৃহন্নলারূপী অর্জুনকে বিরাট রাজের গোধন রক্ষার আবেদন করলেন। পাণ্ডবদের এখন অজ্ঞাতবাস, কুরুসেনার সঙ্গে যুদ্ধে যদি পরিচয় প্রকাশিত হয় তবে আবার দ্বাদশ বর্ষের বনবাস। বৃহন্নলারূপী অর্জুন তখন কঙ্করূপী যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করলেন। যুধিষ্ঠির হিসাব করে দেখলেন অজ্ঞাতবাসের একবৎসর অতিবাহিত হয়ে গেছে এবার প্রকাশ্যে আসা যায়।

অর্জুন বিরাট পুত্র উত্তরকে বললেন রথের সারথি হবার জন্য। উত্তর প্রথমে সংশয় প্রকাশ করল বৃহন্নলা বিশাল কুরুবাহিনীর সঙ্গে কী যুদ্ধ করবে? সৌরিন্দ্রী বললেন পাণ্ডব সভায় থাকার সময় এই বৃহন্নলা পাণ্ডবদের হয়ে বহু রথী মহারথীকে যুদ্ধে পরাস্ত করেছেন। আশ্বস্ত হয়ে উত্তর অর্জুনের রথের সারথি হয়ে বসল। উত্তরকে নিয়ে অর্জুন প্রথমে গেল সেই শমীবৃক্ষের কাছে যেখানে অজ্ঞাতবাস শুরুর সময়ে পাণ্ডবেরা

তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রেখেছিলেন। উত্তরকে দিয়ে সেই বৃক্ষ থেকে অস্ত্রগুলি নামিয়ে আনলেন। এইবার অর্জুন সেই মায়া রথকে স্মরণ করেন। স্মরণমাত্র সেই শ্বেতাশ্ব যুক্ত কপিধ্বজ রথ উপস্থিত হয়। অর্জুন বৃহন্নলার বেশ পরিত্যাগ করে যোদ্ধার বেশ পরিধান করে রথে আরোহণ করেন। উত্তর সারথির আসনে। অর্জুনের নির্দেশে উত্তর রথ চালনা করে যেখানে বিরাট রাজার ষাট লক্ষ গোধন কুরুসেনারা বেষ্টন করে আছে। অর্জুন সর্বপ্রথম অস্ত্রাঘাতে সেনাবেষ্টনী ভঙ্গ করে ধেনুগুলি মুক্ত করেন বেষ্টনী মুক্ত হয়ে ধেনুগুলি সমুদ্রের স্রোতের মতো বেরিয়ে আসে। রক্ষকরা ভরসা পেয়ে তাদের গোগৃহের দিকে চালনা করে।

গোধন মুক্ত করে নিয়ে যাচ্ছে দেখে কুরুপক্ষের বীরেরা একে একে অর্জুনকে আক্রমণ করে। সর্বপ্রথম গুরু দ্রোণাচার্যকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক যুদ্ধ করে অর্জুন তাঁকে পরাজিত করেন। তারপর একে একে কৃপাচার্য, কর্ণ, অশ্বত্থামা অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসে পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। এইবার ভয়ার্ত সৈন্যগণ রণক্ষেত্র ছেড়ে যে যেদিকে পারছে পলায়ন করছে। পলায়নপর সেনাদের দিকে না তাকিয়ে অর্জুন উত্তরকে পিতামহ ভীষ্মের দিকে রথ চালনা করতে বললেন। কুরু সেনাপতি ভীষ্ম এখন দুর্যোধনকে রক্ষা করছেন। নিকটবর্তী হয়ে অর্জুন বরুণ বাণে সর্বপ্রথম পিতামহ ভীষ্মের চরণধৌত করলেন। প্রীত হয়ে ভীষ্ম দুই বাণ নিক্ষেপ করে অর্জুনের শির স্পর্শ করে আশীর্বাদ করলেন। ভীষ্মের রথের চারজন রক্ষক ছিল — দুঃশাসন, দুঃসহ, দুর্ম্মুখ, ধিবিংশতি। অর্জুনের রথ অগ্রসর হলে প্রথমে দুঃশাসন তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করে অর্জুনের উপর। অর্জুনের শরাঘাতে দুঃশাসন জর্জরিত হয়ে পলায়ন করে। এইবার বাকি তিন বীর একযোগে অর্জুনকে আক্রমণ করে। দুই বানে দুর্ম্মুখকে অচেতন করেন অর্জুন। দুর্ম্মুখকে অচেতন দেখে বাকি দুইজন পালিয়ে যায়। এইবার পার্থ রথ নিয়ে এগিয়ে গেলেন ভীষ্মের কাছে, মুখোমুখি ভীষ্মের। আবার পাদস্পর্শ করলেন পিতামহের, স্মিত হাস্যে বললেন,

—পিতামহ! আপনাকে এখানে দর্শন করতে পেরে আমি অত্যন্ত প্রীত। কিন্তু আপনার এই মৎস্যরাজ্যে আগমনের হেতু আমাকে অত্যন্ত লজ্জিত করেছে। দুর্যোধন শেষ পর্যন্ত আপনাকে গো-তস্করে রূপায়িত করল? সসৈন্যে আপনি গোধন হরণের জন্য এই বিরাট রাজ্যে চলে এলেন? গোমাতা হরণের পাপ সম্পর্কে আপনি সম্যক জ্ঞাত। দুর্যোধন আপনাকে আর কত নীচে নামাবে?

ভীষ্ম বললেন,

—আমি গোধন হরণের জন্য আদৌ এখানে আসিনি। বিদুরের কাছে আমি জ্ঞাত হয়েছিলাম তোমরা ছদ্মবেশে বিরাটের রাজপ্রাসাদে আছ। বহুদিন তোমাকে না দেখে আমার চিত্ত ব্যাকুল। তোমাকে দেখার জন্য আমি ধৃতরাষ্ট্রের এই ঘৃণ্য প্রস্তাবে সম্মত হয়ে এই মৎস্যরাজ্যে এসেছি। আমার ধন, রাজ্যে কী প্রয়োজন?

অর্জুন বলল,

—পিতামহ, আপনার আশীর্বাদে এই ত্রয়োদশ বর্ষ আমরা নির্বিঘ্নে কাটিয়েছি। এই কপট পাশাখেলায় আমরা যে দুঃখ ও অপমান সহ্য করেছি, তার উচিত ফল এই দুষ্ট কুচক্রীদের দেব। এইবার আপনার রথ একপাশে নিতে বলুন। আমি দুর্যোধনের মুখোমুখি হই।

ভীষ্ম বললেন, তা কী করে সম্ভব? আমি দুর্যোধনকে রক্ষা করছি। আমাকে পরাজিত না করে তুমি দুর্যোধনের কাছে যেতে পারবে না।

অর্জুন বললেন,

—তবে বিলম্ব কেন? শুরু হোক যুদ্ধ। দুর্যোধনের কাছে আমি যাবই।

এই কথা বলে অর্জুন ভীষ্মের প্রতি পঞ্চবাণ নিক্ষেপ করলেন। ভীষ্ম পঞ্চবাণেই কাটলেন সেই বাণ। এবার ভীষ্ম অর্জুনের প্রতি অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করলেন, অর্জুন বরুণ বাণে সেই অগ্নিবাণ নির্বাপিত করলেন। এইবার ইন্দ্রবাণে অর্জুন ভীষ্মের ধনু কাটলেন। ভীষ্ম অন্য ধনু গ্রহণ করলেন, অর্জুন সেই ধনু কেটে দিব্যাস্ত্রে তাঁর কবচ কাটলেন। এইবার দশ বাণে বিদ্ধ করলেন ভীষ্মের শরীর। ভীষ্ম অচেতন হলে অর্জুন দুর্যোধনের সন্ধানে যান।

ভীষ্মকে পতিত দেখে দুর্যোধন নিজেই এগিয়ে আসে অর্জুনের দিকে, সহ যোদ্ধাদের নিয়ে আক্রমণ করে অর্জুনকে। অর্জুনের বাণে দুর্যোধনের কবচ ও ধনু কাটা যায়। অর্জুনের ভল্লা দুর্যোধনের হস্তীর মস্তকে বিদ্ধ হয়। হস্তী ভূমিশয্যা গ্রহণ করে, দুর্যোধন এক লাফে হস্তীপৃষ্ঠ থেকে নেমে পলায়ন করতে থাকে। দুর্যোধনের ভাই ও অনুচরবর্গ তার অনুসরণ করে। তখন অর্জুন তাকে ডাক দিয়ে বলেন,

তুই নাকি মহামানী দুর্যোধন। এখন রণক্ষেত্র থেকে শৃগালের মতো পালিয়ে যাচ্ছিস? এই মুহূর্তে তোকে আমি মারতে পারি কিন্তু মারলাম না। নিলর্জ্জ জীবন নিয়ে তুই পালিয়ে যা। এই সাহস নিয়ে গোধন হরণে এসেছিলি? পলায়িত জনকে আমি মারি না।

অর্জুনের এই কটুবাক্য দুর্যোধনের পৌরুষে আঘাত করে। যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে আসে সে। তার প্রত্যাবর্তন দেখে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপা, কর্ণ, দুঃশাসন-সহ সব কুরু যোদ্ধারা অর্জুনকে বেষ্টন করে, একযোগে আক্রমণ করে। চারদিক থেকে নানা অস্ত্র ছুটে আসছে অর্জুনের দিকে। অর্জুন দিব্যাস্ত্রে সব খান খান করছেন। অর্জুনের বাণে আকাশ আচ্ছাদিত আর মেদিনী আচ্ছাদিত অশ্ব, হস্তী, ভগ্ন রথ আর কুরুসৈন্যদের মৃতদেহ। কুরুসৈন্যেরা এবার আর রণে ভঙ্গ দিচ্ছে না। পরের জন্য এই জ্ঞাতি বধ অগ্রজ যুধিষ্ঠির অনুমোদন করবেন কিনা তা নিয়ে আবার অর্জুন চিন্তিত। রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন অগৌরবের, দুর্যোধনের মিত্ররা এনিয়ে

হাসাহাসি করবে। তখন তাঁর মনে এলো ইন্দ্রদত্ত সম্মোহন অস্ত্রের কথা। কুরুসেনাদের প্রতি প্রয়োগ করলেন সম্মোহন অস্ত্র। যে যেখানে যে অবস্থায় ছিল সে সেখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়লো। অর্জুন দুর্যোধনের মুকুট কেটে নিল, শকুনিকে গর্ধবের পিঠে বেঁধে রাখল। ভীষ্ম, দ্রোণ ছাড়া সকল সেনাপতির উষ্ণীষ উত্তর ছিনিয়ে নিল ভগিনী উত্তরা পুতুল খেলবে বলে। কুরুসেনাদের সেই অবস্থায় রেখে অর্জুন উত্তরকে বললেন রথ চালাতে। শমীবৃক্ষের নীচে থামল রথ, অর্জুন বেশ পরিত্যাগ করে আবার সেই বৃহন্নলার পোশাক পরলেন। ফিরে গেলেন বিরাট রাজপ্রসাদে।

এদিকে ধীরে ধীরে চেতনা ফিরছে, কুরুসেনাদের দুর্যোধন দেখল তার মুকুট ছিন্ন। ভীষ্ম বললেন কৃপা করে অর্জুন তোমার প্রাণভিক্ষা দিয়েছে, মুকুট ছিন্ন করেছে, মস্তক ছিন্নও করতে পারত। মাতুল শকুনিকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। অবশেষে পাওয়া গেল গর্ধভপৃষ্ঠে আবদ্ধ অবস্থায়। এই সময় এল রাজা সুশর্ম্মা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত অবস্থায়। বলল,

—আমি দক্ষিণ গোশালার সমস্ত ধেনু হরণ করে এনেছিলাম। হঠাৎ কোথা থেকে এক গন্ধর্ব এসে আমার সৈন্যদের প্রহার করে, হত্যা করে অশ্ব হস্তীদের ছুঁড়ে ফেলে, রথ বিচূর্ণ করে ধেনুগুলি বিরাটের গোশালায় পাঠিয়ে দিল। বিরাটকে মুক্ত করে আমাকে বন্দি করে নিয়ে গেল বিরাটের প্রাসাদে। বিরাটের পার্ষদ কঙ্কের কৃপায় আমি মুক্তি পেয়েছি। তোমরা পালাও, সেই যক্ষ এখানে এলে আর কারও রক্ষা নেই।

ভীষ্ম বললেন,

—সুশর্ম্মার বর্ণনা থেকে বোঝা যাচ্ছে ওই গন্ধর্ব নিশ্চয়ই ভীমসেন। অর্জুনের হাত থেকে রেহাই পেয়েছ কিন্তু ভীমের হাত থেকে মুক্তি নেই।

দুর্যোধন বলল,

—ওরা অজ্ঞাতবাসের মধ্যে ধরা পড়েছে। তাই আবার দ্বাদশ বর্ষের বনবাস।

ভীষ্ম বললেন,

—সপ্তদশ দিবস আগে ওদের অজ্ঞাতবাসের মেয়াদ শেষ হয়েছে। এখন ওরা মুক্ত।

* * * *

মুকুট হারিয়ে, ব্যর্থ মনোরথ হয়ে বিরাট রাজ্য থেকে অবশিষ্ট সৈন্য-সহ হস্তিনাপুরে ফিরে এল দুর্যোধন। অর্জুনের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং পাণ্ডুপুত্রদের কুশল সংবাদ পেয়ে হৃষ্টমন ভীষ্মের। উত্তর গোশালার অপমান কিছুতেই ভুলতে পারছে না দুর্যোধন। একা অর্জুন সমগ্র কুরু সৈন্যদের বিপর্যস্ত করল। পাঁচভাই সম্মিলিত ভাবে এলে কী হতো? এখন আবার তাদের দোসর শক্তিশালী পাঞ্চাল, মৎস্য, এখনই যদি এই শত্রু সমূলে বিনাশ করা না যায় তবে সমূহ বিপদ। মন্ত্রণাসভায় বসলেন দুর্যোধন, সঙ্গে কর্ণ, শকুনি, দুঃশাসন। তৈরি হচ্ছে নানা পরিকল্পনা— পঞ্চপাণ্ডব-সহ পাঞ্চালরাজ, মৎস্যরাজকে ভোজনের জন্য আমন্ত্রণ করে আহার্যের সঙ্গে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা, বিশাল বাহিনী নিয়ে বিরাট নগর আক্রমণ করে সবান্ধব পাণ্ডবদের নিহত করা। এই হেতু দিকে দিকে বন্ধু নৃপতিদের পত্র পাঠানো হোক, সসৈন্য আগমনের জন্য। যুদ্ধের জন্য সৈন্য সমাবেশ। কুচক্রী মন্ত্রীদের যুক্তি হলো ক্ষত্রিয় জাতি কদাচিত যুদ্ধ বিমুখ হয় না। যুদ্ধ জয়ের জন্য ছলনার আশ্রয় নেওয়াও ক্ষত্রিয়ের কাছে অধর্ম নয়।

কুরুকুলে কোনো সিদ্ধান্ত ভীষ্মের অনুমোদন ছাড়া গৃহীত হয় না। এই প্রস্তাব ভীষ্ম অনুমোদন করতে পারলেন না। দুর্যোধনকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন এই ভ্রাতৃবিরোধ অহেতুক। রক্তক্ষয় অপ্রয়োজনীয়। এই যুদ্ধ জয়ে কোনো যশ নেই। পাণ্ডবেরা দুর্যোধনের কিছু অহিত কখনো করেনি। পাশায় জিতে তাদের সর্বস্ব হরণ করেছ, তাতেও তারা ক্রুদ্ধ হয়নি। এক্ষণে তাদের রাজ্যপাট তাদের ফিরিয়ে দাও। পূর্বে বনবাস আর অজ্ঞাতবাসের পর তাদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবে বলে অঙ্গীকার করেছিলে আমাদের উপস্থিতিতে।

ভীষ্মের এই বাক্য শুনে দুর্যোধন বলল,

—শত্রুকে যে রাজ্য ফিরিয়ে দেয় সে ক্ষত্রিয়ের মধ্যে অযোগ্য। আমি কদাপি শত্রুর ভজনা করবো না। যুদ্ধ অনিবার্য, যুদ্ধ হবেই।

তখন একে একে আচার্য দ্রোণ, আচার্য কৃপ, বিদুর, অশ্বত্থামা সকলেই ভীষ্মের বচন মেনে নেওয়ার জন্য দুর্যোধনকে অনুরোধ করলেন। দুর্যোধন অনমনীয়। তখন ভীষ্ম বললেন—যুদ্ধানলে ধ্বংসই তোমার নিয়তি।

ভীষ্ম, বিদুর এবং অন্যান্য বীর যোদ্ধা যারা কুরু-পাণ্ডব উভয় পক্ষের হিতকাঙ্ক্ষী, তারা অনেক বোঝালেন দুর্যোধনকে, পাণ্ডবদের ন্যায্য বুঝিয়ে দিয়ে এক আত্মঘাতী যুদ্ধ রদ করার জন্য। এমনকী শ্রীকৃষ্ণ এলেন পাণ্ডবদের দূত হয়ে, পাঁচ ভাইয়ের জন্য মাত্র পাঁচ খানা গ্রাম, এই তাঁদের প্রার্থনা। শ্রীকৃষ্ণকে অনেক অপমান করলেন দুর্যোধন, বন্দি করার চেষ্টাও করল। দুর্যোধনের এককথা 'বিনাযুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী'। দুর্যোধনের এই অবিমৃশ্যকারিতায় ভীষ্ম চিন্তিত, বিদুর চিন্তিত। ধৃতরাষ্ট্রও আর দুর্যোধনের স্বেচ্ছাচারিতা মেনে নিতে পারছেন না। এমন সময় কুরু রাজসভায় একদিন উপস্থিত হলেন মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস। মুনিকে দেখে সবাই তাঁর চরণ বন্দনা করল। পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়ে পবিত্র আসনে বসানো হলো। রাজার ও মন্ত্রীদের চিন্তান্বিত দেখে মুনি বললেন,

—বৃথা শোক করো না। দৈবের নির্বন্ধ কখনও বিফল হয় না। ভারত যুদ্ধ অনিবার্য। এই যুদ্ধে কুরুবংশ ধ্বংস হবে, আর বীর গতি প্রাপ্ত হবে অসংখ্য বীর। পৃথিবী থেকে মুছে যাবে অনেক রাজবংশের অস্তিত্ব। এ ব্রহ্মার নির্বন্ধ, খণ্ডন করা যাবে না। ব্রহ্মার কাছে বসুন্ধরা নিবেদন করেছিলেন অসুরের ভার তিনি আর সহ্য করতে পারছেন না। তাঁর পাতালে যাওয়া ছাড়া আর গতি নেই।

ধরণীকে আশ্বস্ত করলেন
দ্মযোনি, অল্পদিনের মধ্যে তিনি
রণীর ভার লাঘব করবেন।
রণীকে বিদায় দিয়ে ব্রহ্মা
লিকে আজ্ঞা দিলেন কুরুবংশে
ন্ম নিতে। ব্রহ্মার আদেশে কলি
রুবংশে তোমার পুত্ররূপে জন্ম
য়েছে। দুর্যোধনই কলি । তার
ারণেই ক্ষিতিভার লাঘব হবে।
ই যুদ্ধে পৃথিবীর বহু রাজা নিধন
বে। কুরুবংশ ধ্বংস হবে। আমি
ঞ্জয়কে দিব্য দৃষ্টি দিচ্ছি সে
তামাকে প্রতিদিন যুদ্ধের বিবরণ
ণানাবে। সঞ্জয়কে দিব্য দৃষ্টি
য়ে ব্যাসদেব অন্তর্ধান করলেন।

যুদ্ধ নিশ্চিত। কৌরব-
াণ্ডবেরা ভারতবর্ষব্যাপী
াজাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে নিজ
াজ পক্ষে যোগদান করার জন্য।
ৌরবদের পক্ষে এগারো
াক্ষৌহিণী এবং পাণ্ডবদের পক্ষে
াত অক্ষৌহিণী সেনা সংগ্রহ
য়ে গেছে।

* * * * *

কুরুবংশীয় বা কুরুদের সঙ্গে
কানোভাবে যুক্ত প্রবীণ আর
বীনদের মধ্যে দুটো দল হয়ে
ল। প্রবীণদের যে দল তাঁদের
ধান হলেন পিতামহ ভীষ্ম,
াদুর, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য। এঁরা
খনও এই যুদ্ধ চাননি। এঁরা
ান্তিবাদী, যুদ্ধের বিপক্ষে।

অপরদিকে নবীনদের একটি
ল, যারা এই যুদ্ধটাকে অনিবার্য
রে তুলেছিল। দুর্যোধন,
ঃশাসন, শকুনি, কর্ণ। এরা
দ্ধবাদী, যুদ্ধের পক্ষে।

আর এই দুই দলের মাঝখানে
ড়ে আছেন পুত্রস্নেহে অন্ধ,
াস্থিরচিত্ত, জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র।
কদিকে তাঁর অন্তরের প্রচ্ছন্ন
ভ বুদ্ধি বর্ষীয়ানদের সম্মান
াদচ্ছে, সায় দিচ্ছে। অপর দিকে

তাঁর অশুভ পাপবুদ্ধি, আর লোভ মোহ, চরম হিংসাশ্রয়ী, স্বার্থান্বেষী নবীন দলকে সমর্থন করছে, সাহস যোগাচ্ছে। এই দুই শক্তির অদৃশ্য আকর্ষণে রক্তাক্ত হচ্ছে তাঁর অন্তঃকরণ।

এই যুদ্ধ যদি শুধুমাত্র কুরু ও পাণ্ডব দুই জ্ঞাতি, দুই পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত তাহলে ভীষ্ম কিছুতেই পাণ্ডুপুত্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন না। কিন্তু এই যুদ্ধ কেবলমাত্র জ্ঞাতি বিরোধের জন্য নয়, এর পেছনে আছে এক গভীর প্রচ্ছন্ন রাজনীতি।

পাণ্ডবদের সঙ্গে রয়েছে কুরুদের চিরশত্রু পাঞ্চাল আর মৎস্যদেশ, মগধও তাদের সহযোগী। যুধিষ্ঠিরের জয়ের অর্থ হলো পাঞ্চাল, মৎস্য আর মগধের জয়। কুরুবংশের মর্যাদা ও প্রভুত্বহানি। একমাত্র কুলগৌরব ও বংশমর্যাদা রক্ষার জন্য ভীষ্ম এই অন্যায় যুদ্ধে দুর্যোধনের পক্ষ নিয়েছিলেন। এই যুদ্ধ ভীষ্মের কাছে আত্মঘাতী, মর্মবিদারক, তবুও তিনি যুধিষ্ঠিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন। কারণ তিনি চাননি পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ কিংবা মৎস্যরাজ বিরাট ভারত সম্রাট হোক কিংবা কোনোভাবে ভারত সম্রাটকে প্রভাবিত করুক। তাই আত্মীয় হয়েও মাতুল মদ্ররাজ শল্য পাণ্ডবদের পক্ষ নিতে পারলেন না। প্রতিবেশী মদ্র ও মৎস্য রাজ্যের পারস্পরিক বিরোধ ও শত্রুতাই মদ্ররাজ শল্যকে শেষপর্যন্ত ঠেলে দিল দুর্যোধনের পক্ষে। আচার্য দ্রোণও প্রিয় শিষ্য ও সন্তানতুল্য পাণ্ডবদের বিপক্ষে দাঁড়ালেন। কেন? কারণ তার পরম শত্রু পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ পাণ্ডবদের পরম আত্মীয়, অভিভাবক, পাণ্ডবদের পক্ষে।

কুরুক্ষেত্র প্রাঙ্গণে মহারণে উভয়পক্ষ উপস্থিত। কৌরব পক্ষের সেনাপতি ভীষ্ম এবং পাণ্ডব পক্ষের ধৃষ্টদ্যুম্ন। ভীষ্ম দুর্যোধনকে বললেন তিনি যতদিন যুদ্ধ করবেন ততদিন সুতপুত্র কর্ণ যেন যুদ্ধক্ষেত্রে না আসে এবং অস্ত্রধারণ না করে। ভীষ্ম দশদিন যুদ্ধ করবেন। দুর্যোধন সম্মত হলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে কৌরবদের সৈন্যসংখ্যা অনেক বেশি, একাদশ অক্ষৌহিণী আর পাণ্ডবদের সাত অক্ষৌহিণী। যুদ্ধ যাত্রার প্রাক্কালে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বললেন,

—যুদ্ধক্ষেত্রে খুব সাবধান থাকতে হবে, কৌরবদের সৈন্য আর রণসম্ভার বিপুল।

অর্জুন বললেন,

—সংখায় বেশি হলে শক্তিতে শ্রেষ্ঠ হয় না। কৌরবদের পরাজয় নিশ্চিত। স্বয়ং কৃষ্ণ আমাদের সহায়।

এই যুদ্ধে পাণ্ডবদের পক্ষে কৃষ্ণ, তিনি অস্ত্র ধারণ করবেন না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তাই তিনি অর্জুনের রথের সারথি। আর তাঁর অপরাজেয় নারায়ণী সেনা কৌরবদের পক্ষে।

ভীষ্ম কুরুপক্ষের সেনাপতি। ভীষ্ম দুর্যোধনকে বললেন,

—যথাসাধ্য যুদ্ধ আমি করবো, তবে সম্মুখে কোনো অমঙ্গল চিহ্ন দেখলে সেই মুহূর্তে অস্ত্র ত্যাগ করবো।

কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে উভয় পক্ষের সৈন্য মুখোমুখি। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের রথ নিয়ে গেলেন দুইপক্ষেব মাঝখানে । সম্মুখে যুদ্ধার্থী পরমাত্মীয়দের দেখে অর্জুন বিষাদমগ্ন হলেন। তিনি গাণ্ডীব রেখে দিলেন। কৃষ্ণকে জানিয়ে দিলেন এই স্বজনদের বধ করে তিনি রাজ্য চান না।

তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সেই রণভূমেই সংসার ও জীবনের অনিত্যতা সম্পর্কে কালজয়ী উপদেশ দিলেন। যে অমৃতবাণী পরবর্তী কালে শ্রীমদ্ভগবদগীতা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, তুমি যাদের বধ করবে বলে ভাবছ, আমি তাদের আগেই বধ করে রেখেছি— 'ময়ৈবেতে নিহতাঃ পূর্বমেব'। তিনি সেই রণক্ষেত্রে যুদ্ধ শুরুর প্রাক্‌মুহূর্তে সখা অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করালেন। অর্জুনের সব সংশয়ের নিরসন হলো, আবার গাণ্ডীব তুলে নিলেন হাতে।

যুদ্ধের পূর্ব রাত্রে ভীষ্মের শিবিরে গিয়েছিলেন যুধিষ্ঠির। ভীষ্মকে প্রণাম করে যুদ্ধের অনুমতি চাইলেন। ভীষ্ম বললেন— তুমি প্রথমে আমার কাছে না এলে অভিশাপ দিতাম। তোমার এই শ্রদ্ধা বিনয় দেখে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। অনুমতি দিলাম তুমি যুদ্ধ কর। আশীর্বাদ করি তুমি জয়ী হবে— 'প্রীতোহহং পুত্র যুধ্যস্ব জয়মাপ্নুহি'। তুমি আমার কাছে আর কী বর চাও।

—আপনি কৌরবদের হয়েই যুদ্ধ করুন, কিন্তু আমাদের হিতের জন্য মন্ত্রণা দিন।

—মন্ত্রণা দেবো, আবার এসো।

প্রথম দিন ভীষ্ম এমনই যুদ্ধ করলেন যে পাণ্ডবপক্ষে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠলো। অর্জুন-সুভদ্রার পুত্র অভিমন্যু এল ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। ভীষ্ম বিস্মিত হলেন এই বালকের রণনৈপুণ্যে। যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে রণক্ষেত্রের অপর প্রান্ত থেকে চলে এলেন অর্জুন। কালান্তক যমের মতো অর্জুন কুরুসৈন্য নিহত করতে লাগলেন। সহস্র সহস্র গজ-বাজি মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। এমন সময় সূর্যদেব অস্তাচলে গেলেন। শঙ্খনাদের মাধ্যমে যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হলো।

তৃতীয় দিনের যুদ্ধে ভীষ্ম এমন ভয়ানক যুদ্ধ করলেন যে পাণ্ডব সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। বাণাঘাতে অর্জুন মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন।

কয়েকদিন যুদ্ধ চলার পর দুর্যোধন যখন দেখলেন ক্রমেই যুদ্ধজয় অসম্ভব হয়ে পড়ছে তখন ভীষ্মকে বাক্যযন্ত্রণা দিতে লাগলেন। বললেন,

—পিতামহ আপনি আমাকে কৃপা করুন। আপনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, পাঞ্চাল, কেকয়,সোমক বাহিনীকে ধ্বংস করবেন। আপনি সেই প্রতিজ্ঞা পালন করুন। আর যদি আমার দুর্ভাগবশত আমার প্রতি বিদ্বেষ নিয়ে আপনি পাণ্ডবদেরই রক্ষা করতে চান, তাহলে আপনি সেনাপতিত্ব ত্যাগ করুন। কর্ণকে যুদ্ধ করার অনুমতি দিন। সেনাপতি হয়ে কর্ণই পাণ্ডবদের পরাজিত করবে।

দুর্যোধনের এই বাক্যবাণে ভীষ্ম মর্মে মর্মে আহত হলেন।

তারপর ক্রুদ্ধ ও কাতর কণ্ঠে বললেন—দুর্যোধন, আমাকে এমন করে বাক্যবাণে পীড়িত করছ কেন? আমি তো প্রাণপণে যুদ্ধ করছি। তুমি কি জান না অর্জুনের পরাক্রম? খাণ্ডবদহনকালে অর্জুন ইন্দ্রকেও পরাজিত করেছিল। ঘোষযাত্রায় গন্ধর্বদের হাত থেকে অর্জুনই তোমাকে উদ্ধার করেছিল। তখন কর্ণ পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছিল। স্বয়ং কৃষ্ণ পাণ্ডবদের রক্ষক, সেই পাণ্ডবদের জয় করা সহজ নয়। হ্যাঁ, আমার প্রতিজ্ঞা সোমক, পাঞ্চাল, কেকয়,মৎস্যদের ধ্বংস করব। যাও রাত্রি হয়েছে। এখন নিশ্চিন্তে নিদ্রা দাও। আগামীকাল ভীষ্মের যুদ্ধ জগৎ দেখবে।

পরের দিনের যুদ্ধে ভীষ্ম যেন কালান্তক যম হয়ে উঠলেন। ভয়ার্ত পাণ্ডব সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে লাগল। অর্জুন শরাঘাতে রথের উপর মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। কুরু সৈন্যদের জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হলো। সূর্যদেব অস্তাচলে গেলেন। দুর্যোধন হৃষ্টচিত্তে শিবিরে ফিরে গেলেন। এরপর ভীষ্ম আরও কয়েকদিন ভীষণ যুদ্ধ করলেন পাণ্ডবদের বহু সৈন্য হতাহত হলো। দুর্যোধন কুচক্রী মন্ত্রীদের নিয়ে মন্ত্রণায় বসলেন। শকুনি পরামর্শ দিল বৃদ্ধ ভীষ্মকে আরও বাক্যবাণে বিদ্ধ করতে হবে। তবেই তিনি কঠোর সিদ্ধান্ত নেবেন। দুর্যোধন গেলেন ভীষ্মের কাছে, বললেন—

—পিতামহ আমার ভাইয়েরা একের পর এক নিহত হচ্ছে ভীমের হাতে। অথচ ওদের গুটিকতক সৈন্যের ক্ষতিই হয়নি। এরকম চলতে থাকলে আমাদের পরাজয় অনিবার্য। আপনি কুরু সেনাপতি, আমার একমাত্র আশ্রয় আপনি কোনো উপায় করুন।

বারংবার একই অনুযোগে ক্ষিপ্ত হয়ে ভীষ্ম তূণ থেকে মহাকাল নামে পাঁচটি বাণ বের করে বললেন, এই পাঁচবাণেই আগামীকাল তিনি পঞ্চপাণ্ডবকে বধ করবেন। ত্রিলোকের আধিপত্য পেলেও দুর্যোধন হয়তো এতটা উল্লাসিত হতো না। শকুনি দুর্যোধনকে এই শুভসংবাদ দেওয়ার জন্য দ্রুত শিবিরের দিকে পা বাড়ালেন দুর্যোধন। উত্তেজনার বশে ভীষ্ম পাণ্ডববধের প্রতিজ্ঞা করেছেন। তিনি মনেপ্রাণে চাইছেন এই প্রতিজ্ঞা যেন ভঙ্গ হয়।

ভীষ্মের এই ভীষণ প্রতিজ্ঞার বার্তা পৌঁছে গেছে পাণ্ডব শিবিরে। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা অবজ্ঞার বিষয় নয়। চিন্তিত যুধিষ্ঠির, তবে ভরসা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ। অর্জুনের দৈহিক গঠন ও কণ্ঠস্বর অনেকটা দুর্যোধনের মতো। শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে অর্জুন দুর্যোধনের কাছ থেকে পূর্বের প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে তাঁর মুকুটটি চেয়ে আনলেন এবং মস্তকে পরে সেই রাত্রে ভীষ্মের কাছে গেলেন। রাত্রে প্রদীপের স্তিমিত আলোকে ভীষ্ম দেখলেন দুর্যোধন আবার এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর পায়ের কাছে। ভীষ্ম বললেন,

—দুর্যোধন।

—হ্যাঁ, পিতামহ।

—এত রাতে তুমি আমার শিবিরে কেন?

—সেই পাঁচটি বাণ আপনি কোথায় রেখেছেন?

—আছে আমার কাছে।

—ওই বাণ পাঁচটি আমায় দিন আমি নিজের হাতে এই পাঁচ ভাইকে হত্যা করবো।

—বেশতো এই নাও।

ভীষ্ম দুর্যোধন ভেবে অর্জুনের হাতে তুলে দিলেন পঞ্চবাণ। বাণ নিয়ে দ্রুত চলে গেলেন অর্জুন। ভীষ্ম যেন ভারমুক্ত হলেন। এই সময় দেখা দিলেন শ্রীকৃষ্ণ। ভীষ্ম সবই বুঝলেন। বললেন, ছলনা করে অস্ত্র হরণ করালে দয়াময়? আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করালে। তুমিও এই যুদ্ধে অস্ত্রধাণ করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলে, আগামীকাল তোমার সেই প্রতিজ্ঞা আমিও ভাঙবো।

পরের দিন ভীষ্মের প্রচণ্ড আক্রমণে পাণ্ডবসৈন্য ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ল। রথী, মহারথী, সৈন্য সব পালাতে লাগল। অর্জুন চেষ্টা করেও নিবারণ করতে পারছিলেন না। পাণ্ডব পক্ষে হাহাকার উঠল, সাত্যকি প্রাণপণে ব্যূহ রচনা করছেন। চারদিকে স্তূপীকৃত মৃতদেহ। রক্তের নদী। রক্ত মাংসের কর্দম। মৃত সৈন্য, অশ্ব, গজে রথের গতি রুদ্ধ। অগণিত ছিন্ন মুণ্ড, ভ্রষ্ট মুকুট, বিক্ষিপ্ত রত্নহার, স্বর্ণকবচ, মুক্তা মাণিক্য, ভূমিতে অকীর্ণ যেন নক্ষত্রমালা। সেই ঘোর রণভূমিতে ভীষ্মের বিধ্বংসী শরনিক্ষেপে মৃত্যু আর মৃত্যু। আজ যেন আর কারও রক্ষা নেই।

বিপদ বুঝে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের রথ ভীষ্মের সামনে এনে বললেন,

—পার্থ, তোমার আকাঙ্ক্ষিত কাল উপস্থিত। যদি মোহগ্রস্ত না হও তবে ভীষ্মকে আক্রমণ কর।

অর্জুন নিরুত্তাপ, যুদ্ধেরও কোনো ক্ষিপ্রতা নেই। ভীষ্মের ক্রমাগত বাণ বর্ষণে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন দুজনেই আহত। তথাপি অর্জুন প্রতিআক্রমণের পথে যাচ্ছেন না। শ্রীকৃষ্ণ ভাবলেন এইভাবে যদি চলে তবে অচিরেই পাণ্ডববাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সৈন্যরা পলায়নরত। প্রতিরোধ ব্যূহ ভেঙে পড়েছে। ওই যে দ্রোণ, জয়দ্রথ, ভুরিশ্রবা কৃতবর্মা অগণিত কৌরবসৈন্য নিয়ে অর্জুনকে ঘিরে ফেলেছে। তবুও অর্জুন নিশ্চেষ্ট। অর্জুনের বিপদ দেখে সাত্যকি চিৎকার করে সৈন্যদের বলছেন,

—তোমরা পালিও না। ফিরে এস। যুদ্ধ থেকে পলায়ন ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নয়।

এবার শ্রীকৃষ্ণ সংহারক রূপ ধারণ করলেন। অর্জুনের রথ থেকে দ্রুত অবতরণ করে সাত্যকিকে সম্বোধন করে বললেন,

—বীর সাত্যকি, যারা পালাচ্ছে পালাতে দাও আর যারা আছে তারাও চলে যাক্। আজ আমি একা যুদ্ধ করে ভীষ্ম, দ্রোণকে বধ করে ধৃতরাষ্ট্র কুলের বিনাশ ঘটিয়ে অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরকে রাজা করব।

ক্রুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ হাতে সুদর্শনচক্র নিয়ে ভীষ্মের দিকে এগিয়ে চলেছেন। ভীষ্ম ধনুর্বাণ ত্যাগ করে জোড় হাতে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করে বললেন—

—''হে দেবেশ, জগন্নিবাস মাধব। সর্বশরণ্য লোকনাথ। তোমাকে প্রণাম। হে কৃষ্ণ, তোমার হাতে মৃত্যুবরণ করে আমি ধন্য হব।"

এহ্যেহি দেবেশ জগন্নিবাস।

নমোহস্তুতে মাধব চক্রপাণে।।১৬।।

প্রসহ্য মাং পাতয় লোকনাথ।

রথোত্তমাৎ সর্বশরণ্য সংখ্যে।।১৭।। (ভীষ্ম পর্ব ৫৯ অঃ)

অর্জুন রথ থেকে নেমে ছুটে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের পা জড়িয়ে ধরে বললেন —পাণ্ডবদের আশ্রয় হে কেশব, তুমি ক্রোধ সংবরণ কর। আমি পুত্র ও ভ্রাতাদের নামে শপথ করে বলছি, আমার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করব না। দুষ্ট কৌরবদের আমি বধ করব।

শ্রীকৃষ্ণ তখন প্রসন্ন হয়ে রথে ফিরে এসে তাঁর সারথির আসনে বসলেন। অর্জুন গাণ্ডীব তুলে অতি ভয়ংকর মাহেন্দ্র অস্ত্র ত্যাগ করলেন, মুহূর্তের মধ্যে কৌরবের প্রতিরোধ বাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। ভয়, রক্ত আর, আর্তচিৎকারের মধ্যে দিয়ে সেদিন সূর্যাস্ত নেমে এল। যুদ্ধ শেষ হলো।

ভীষ্ম যেভাবে পাণ্ডবসেনা নিধন করছেন তাতে উদ্বিগ্ন যুধিষ্ঠির, এমন কী শ্রীকৃষ্ণও। ভীষ্মের পতন না হলে কৌরব জয় অসম্ভব। পাণ্ডব শিবিরে বসেছে মন্ত্রণাসভা। উপস্থিত যুধিষ্ঠির, শ্রীকৃষ্ণ, ভীম, অজুন, ধৃষ্টদুম্ন, বিরাট। সবারই এক কথা ভীষ্ম বধ। হতোদ্যম হয়ে যুধিষ্ঠির যুদ্ধ ছেড়ে বনে যাবার ইচ্ছাও প্রকাশ করলেন (ন যুদ্ধং রোচতে কৃষ্ণ। বনং যাস্যামি)।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন,

—মহারাজ বিষণ্ণ হবেন না। পাণ্ডবেরা শত্রুহন্তা বীর। অর্জুন ভীষ্মবধে প্রতিজ্ঞা করেছিল। কিন্তু অর্জুন যদি অনিচ্ছুক হয় (যদি নোহুতি ফাল্গুনঃ) তাহলে আমাকে আদেশ করুন, আমিই ভীষ্মকে বধ করব।

তরিৎস্পৃষ্টের মতো স্পন্দিত হলো যুধিষ্ঠিরের দেহ, করজোরে বললেন,

—না বাসুদেব না। তা হয় না। আপনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এই যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবেন না বলে। আমি চাই না আপনার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হোক। পিতামহ আমাকে কথা দিয়েছিলেন, তিনি দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করলেও আমাদের হিতের জন্য মন্ত্রণা দেবেন। এই মহাসংকটে আমরা তাঁকেই জিজ্ঞাসা করি, তাঁর বধের উপায় কী? পিতৃহীন পিতৃস্নেহে প্রতিপালন করেছেন। আজ সেই স্নেহাতুর পিতামহকে আমরা হত্যা করতে চাইছি। ধিক্কার জানাই রাজনীতিকে, ক্ষাত্রধর্মকে আর নিজেকে।

গভীর রাত্রে তাঁরা সবাই গেলেন ভীষ্মের শিবিরে সব শেষে নতমস্তকে অর্জুন। রজনী গভীর, শান্ত, শিবিরের অভ্যন্তরে ক্ষীণ দীপ শিখা। নিদ্রাহীন ভীষ্ম যেন কারও আগমনের অপেক্ষায় প্রতীক্ষারত। বাইরে পদধ্বনি শুনে আহ্বান করলেন—

—ভিতরে এসো।

সবাই শিবিরে প্রবেশ করে ভীষ্মকে প্রণাম করলেন। ভীষ্ম সবাইকে আসন গ্রহণ করতে বললেন। সবাই নীরব, যুধিষ্ঠিরও কথা বলার ভাষা খুঁজে পাচ্ছেন না। তোমাদের আগমনের কারণ আমি জানি। আমি এও জানি তোমরা চিন্তিত। চিন্তার কারণও হয়তো আমি। তোমাদের হয়ে যুদ্ধ করা ব্যতীত আর কী চাও বল? যা চাইবার আজ চেয়ে নাও। অত্যন্ত দুষ্কর হলেও আমি তা পূরণ করব। অধীর আগ্রহে ভীষ্ম বারবার এই কথা বলতে লাগলেন—''তথা ব্রুবানাং গাঙ্গেয়ং প্রীতিযুক্তং পুনঃ পুনঃ (ম. ভা. ভীষ্মপর্ব ১০৭/৬১) যা করার তা অতি দ্রুত করতে হবে, যেন হাতে আর সময় নেই।

যুধিষ্ঠির বললেন—

—এই যুদ্ধে আমাদের কীভাবে জয় হবে?

ভীষ্ম দৃঢ়কণ্ঠে বললেন।

—আমি জীবিত থাকতে তোমাদের জয়ের কোনো আশা নেই।

যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ, অর্জুন কারও মুখে কোনো কথা নেই। কৃষ্ণের ঈশারায় যুধিষ্ঠির কথা বললেন—

—তবে আপনি স্বয়ং আপনার বধের উপায় বলুন (বধোপায়ং ব্রবীতু স্বয়মাত্মনঃ)

—আমার হাতে অস্ত্র থাকলে আমাকে বধ করা অসম্ভব। তবে আমি অস্ত্রত্যাগ করলে আমাকে বধ করতে পারবে। যে নিরস্ত্র, ভূপতিত, বর্মবিহীন, পলায়মান, ভীত, শরণাপন্ন, স্ত্রী কিংবা স্ত্রী-নামধারী, বিকলেন্দ্রিয়, এক পুত্রের পিতা কিংবা নীচ জাতির সঙ্গে আমি যুদ্ধ করি না। তোমাদের পক্ষে আছেন শিখণ্ডী। পূর্ব জন্মে তিনি তোমাদের পিতামহী অম্বিকার জ্যেষ্ঠা সহোদরা ছিলেন। তাঁর নাম ছিল অম্বা। আমার মৃত্যুর কারণ হয়ে জন্মগ্রহণ করার মানসে তিনি জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন। রণক্ষেত্রে তিনি আমার মুখোমুখি হলে আমি অস্ত্র ত্যাগ করবো। শিখণ্ডীকে সামনে রেখে অর্জুন আমাকে বধ করতে পার। আমার মৃত্যু যেমন পাণ্ডবদের বিজয় সূচিত করবে তেমনি এই মৃত্যু আমার শেষ ইচ্ছাও পূর্ণ করবে। শীঘ্র তোমরা আমার বধের চেষ্টা কর। আমি অনুমতি দিচ্ছি নির্দ্বিধায় আমাকে অস্ত্র হেনে বধ কর।

ক্ষিপ্রং ময়ি প্রহরধ্বং যদীচ্ছ রণে জয়ম্।

অযুজ্যানামি বঃ পার্থাঃ প্রহরধ্বং যথা সুখম্।।

(ম. ভা. ভীষ্মপর্ব ১০৭/৭১-৭২)

পাণ্ডবরা তাঁকে প্রণাম করে ফিরে গেলেন শিবিরে। সেই রাত্রে বিনিদ্র কাটল ভীষ্মের। স্মৃতিতে ভর করছে নানা ঘটনা। সেই শৈশবে বশিষ্ঠের কাছে অস্ত্রশিক্ষা। পিতা শান্তনুর সঙ্গে হস্তিনার রাজপ্রাসাদে আগমন। যৌবরাজ্যে অভিষেক। ধীবর রাজের কাছে প্রতিজ্ঞা। পিতা শান্তনুর বিবাহ। ভাইদের জন্ম, চিত্রাঙ্গদের মৃত্যু, বিচিত্রবীর্যের বিবাহহেতু কাশীরাজের কন্যাদের হরণ। অম্বার আত্মাহুতি....। অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশের সময় অম্বার সেই প্রতিজ্ঞা,

—পরের জন্মে তোমার মৃত্যুর কারণ হবো আমি।

মনে পড়ছে দেবর্ষি নারদের সেই ভবিষ্যদ্‌বাণী, কুরুবংশের পতন আসন্ন। মহর্ষি বেদব্যাসের সংকেত স্বয়ং কলি দুর্যোধন রূপে কুরুকুলে জন্মগ্রহণ করেছেন, পৃথিবীর ভার লাঘব করার জন্য। দুর্বিনীত ক্ষাত্রশক্তি নিঃশেষ হবে এই মহাসমরে। শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত পাণ্ডবরা, তাদের জয় অনিবার্য। পূর্বদিগন্তে ক্রমে রক্তিম হচ্ছে, ভোরের পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। শিবির থেকে বেরিয়ে এলেন গঙ্গাপুত্র, পূর্বদিকে মুখ করে সূর্যপ্রণাম করলেন, এই জীবনের শেষ সূর্যপ্রণাম।

এদিকে কুরুক্ষেত্রে রণভেরি বেজে উঠল। পাণ্ডবব্যূহের সম্মুখে আজ শিখণ্ডী। সমস্ত শক্তি দিয়ে পাণ্ডবরা আজ শিখণ্ডীকে রক্ষা করে চলেছে। অর্জুনের রথের সম্মুখে ভীষ্মকে প্রথম আক্রমণ করল শিখণ্ডী। ভীষ্ম অস্ত্রত্যাগ করে বললেন,

—আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করবো না।

—যুদ্ধ করুন, আর নাই করুন আমি আপনাকে বধ করব।

দূর থেকে দুর্যোধন চিৎকার করে বলছে,

—পিতামহ আপনার একি বিচার! শত্রু আমাদের নিপীড়ন করছে আপনি রক্ষা করুন।

নিরাসক্ত কণ্ঠে ভীষ্ম বললেন, দুর্যোধন আমার প্রতিজ্ঞা রেখেছি। আজ আমি রণক্ষেত্রে শয়ন করব।

''অহং বা অদ্য হতঃ।''

পাণ্ডবসেনা ঝাঁপিয়ে পড়ল ভীষ্মের উপরে। নিরস্ত্র নিশ্চেষ্ট ভীষ্মকে বাঁচাবার জন্য দুঃশাসন প্রাণপণ যুদ্ধ করে এগিয়ে আসছে। অর্জুন তাকে প্রতিহত করল।

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করে বললেন,

—আমি নিজের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়েছি। আমি আদেশ করছি আমাকে বধ কর। আমাকে আঘাত কর, আমাকে বধ করার চেষ্টা কর।

নির্বিন্নোহস্মি ভৃশং তাত দেহেনানেন ভারত।

ঘৃতশ্চ মে....

মদ্বধে ক্রয়তাং যত্ন.....

(ম. ভা. ভীষ্ম পর্ব, ১১৫/১৪-১৫)

যুধিষ্ঠির তখন আদেশ দিলেন—

''যুধ্যধ্বং ভীষ্মং জয়ত সুংযুগে''

এই মারাত্মক বাক্যটা উচ্চারণ করতে যুধিষ্ঠিরের কণ্ঠ একটুও কাঁপল না। আজ তোমরা আর মহাবীর ভীষ্মকে ভয় করো না। আঘাত কর।

সহসা ভীষ্মের স্তুতি করে আকাশবাণী হলো। দেবদুন্দুভি বেজে উঠল। দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করলেন। সুগন্ধ সুখস্পর্শ মন্দার বায়ু প্রবাহিত হলো।

সুতীক্ষ্ণ বাণে জর্জরিত ভীষ্মের সর্বাঙ্গ। কিন্তু তাঁর কোনো বিকার নেই। মুখ প্রশান্ত। আকাশে দেখতে পাচ্ছেন সপ্ত বসুকে যাঁরা তার প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছেন। অর্জুন পিতামহের বক্ষস্থল লক্ষ্য করে দিব্যবাণ নিক্ষেপ করলেন শিখণ্ডীর আড়ালে থেকে। সেই বাণ ভীষ্মের কবচ ভেদ করে বক্ষস্থলে বিদ্ধ হলো। ভীষ্ম বুঝতে পারলেন এই বাণ অর্জুনের। তিনি রথ থেকে ভূমিতে পড়ে গেলেন। অজস্র বাণে বিদ্ধ ভীষ্মের শরীর ভূমি স্পর্শ করলো না। কৌরব সৈন্যদের মধ্যে হাহাকার আর পাণ্ডব সৈন্যদের জয় জয়কার। মাতা গঙ্গা ভীষ্মকে নেবার জন্য বাহন হংস প্রেরণ করলেন। তারা গঙ্গাপুত্রকে আহ্বান করলেন মাতৃসমীপে যাত্রার জন্য ভীষ্ম বললেন এখন দক্ষিণায়ন চলছে, উত্তরায়ণের আগে আমি দেহত্যাগ করব না। ভীষ্মের পতনে কৌরব পাণ্ডব উভয় পক্ষ যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে। অবশিষ্ট কৌরব ও পাণ্ডবেরা ভীষ্মকে ঘিরে আছে। প্রত্যেকের মন ভারাক্রান্ত চক্ষু অশ্রু সজল কিন্তু ভীষ্মের বদন মণ্ডল হাস্যোজ্জ্বল। ভীষ্ম হঠাৎ বলে উঠলেন,

—বড় তৃষ্ণা, জল চাই জল।

দুর্যোধন অনুচর পাঠিয়ে নিয়ে এলেন সুবর্ণ ভৃঙ্গারে উত্তম সুগন্ধী পানীয় জল। তিনি সেই জল গ্রহণ না করে অর্জুনের দিকে তাকালেন। সাশ্রুনয়নে অর্জুন গাণ্ডীবে শর যোজনা করে ভূতল ভেদ করলেন, উঠে এল ভোগবতী গঙ্গার পুণ্য শীতল জলধারা। সেই ধারা আপনি পতিত হলো ভীষ্মের মুখে, জননী জাহ্নবী পুত্রের তৃষ্ণা নিবারণ করলেন।

এইবার ভীষ্ম বললেন, উপাধান চাই, আমি এবার বিশ্রাম করবো। ভীষ্ম শরশয্যায় শায়িত হলেও মস্তক ছিল ঝুলে।

ভীষ্ম তাকালেন দুর্যোধনের দিকে, দুর্যোধনের অজ্ঞতায় অনুচরেরা নিয়ে এল মহার্ঘ মখমলের উপাধান। ভীষ্মের মুখে বিরক্তি, তিনি আবার তাকালেন অর্জুনের দিকে। অর্জুন আবার গাণ্ডীবে তির যোজনা করে ভীষ্মের মস্তক লক্ষ্য করে নিক্ষেপ সেই তির, সেই তিরে ভীষ্মের মস্তক স্থির হয়ে গেল। মুখে পরিপূর্ণ প্রশান্তি। দুর্যোধনকে লক্ষ্য করে ভীষ্ম বললেন, —তুমি অর্জুনকে কদাপি জয় করতে পারবে না। এখনও বলি, সন্ধি কর। পাণ্ডবদের অর্ধরাজ্য ফিরিয়ে দাও। আমার মৃত্যুতে তোমাদের শত্রুতার অবসান হোক। রাজ্যে শান্তি ফিরে আসুক।

কিন্তু মুমূর্ষু ব্যক্তির যেমন ওষুধে রুচি হয় না, তেমনি ভীষ্মের বাক্যে দুর্যোধনের রুচি হলো না।

সূর্য অস্তমিত হচ্ছে, একে একে সকলে ভীষ্মকে প্রণাম করে শিবিরে ফিরে যাচ্ছে। শরশয্যার উপর চন্দ্রাতপ টাঙ্গানো হয়েছে। উত্তরায়ণ পর্যন্ত ভীষ্মের দেখাশোনার জন্য নিযুক্ত হয়েছে কয়েকজন সেবক রক্ষী। সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে গ্রাস করছে নির্জন রণভূমিকে। শরশয্যার পাশে জ্বলছে একটা মশাল। হিরন্বতী নদী তীর অন্ধকার, তার থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসছে নিশাচর হিংস্র পশুর ডাক। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, হু হু করে বইছে হিমেল বায়ু। শরশয্যার দিকে এগিয়ে আসছে এক ছায়া মূর্তি। রক্ষী সেবকেরা সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়াল। ছায়ামূর্তি ধীরে ধীরে এসে দাঁড়াল ভীষ্মের পায়ের কাছে। ভীষ্ম অর্ধোন্মিলিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন,

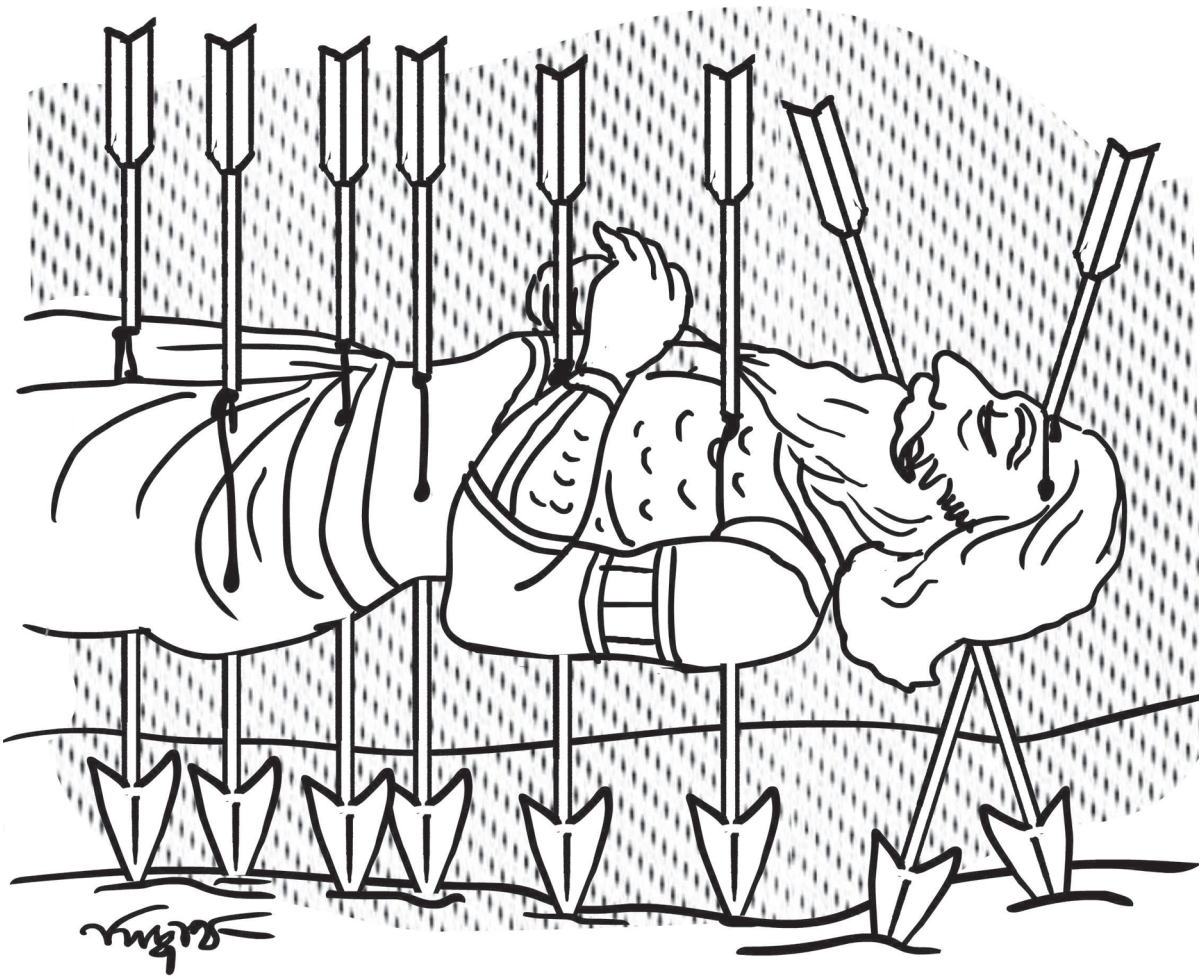

—কে?

—কুরুশ্রেষ্ঠ, যাকে আপনি কোনোদিন পছন্দ করতেন না আমি সেই সুতপুত্র কর্ণ।

ভীষ্ম দেখলেন অশ্রুসিক্ত নয়নে তাঁর পদপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন কর্ণ।

ভীষ্ম বললেন,

—কাছে এসো,

কর্ণ নতজানু হয়ে বসলেন তাঁর পাশে, একদম কাছাকাছি। ভীষ্মের এত কাছাকাছি যাওয়ার সাহস কর্ণ কোনোদিনও করেননি। ভীষ্ম ধীরে ধীরে বললেন,

—হে বীরশ্রেষ্ঠ, তুমি সূতপুত্র নও, তুমি কুন্তীর সন্তান, পাণ্ডবদের ভ্রাতা। নারদের মুখে শুনেছি তোমার অপূর্ব জন্মকথা। তোমার উপর আমার কোনো রাগ বিদ্বেষ নেই। তুমি দুর্যোধনের হীন সংসর্গে পরশ্রীকাতর হয়ে পড়েছিলে, তাই তোমাকে কটুবাক্য বলতাম। আমার অনুরোধ তুমি মাতা কুন্তী আর পাণ্ডবদের সঙ্গে মিলিত হও। সকল শত্রুতার অবসান হোক।

—পিতামহ, তা আর হয় না। আমি দুর্যোধনের সঙ্গে থেকেই প্রাণ দিতে চাই। এতদিন ক্রোধে, উত্তেজনায় কিংবা চপলতা, অজ্ঞানতা বশত আপনাকে যা বলেছি, যা করেছি আপনি দয়া করে আমাকে ক্ষমা করুন।

ভীষ্মের পাদস্পর্শ করে ধীরে ধীরে প্রস্থান করলেন কর্ণ।

রজনীর অন্ধকার সমস্ত কুরুক্ষেত্রকে গ্রাস করেছে। নিশাচর হিংস্র পশুদের চিৎকার আরও প্রচণ্ড। এক ঘোর বিভীষিকা চারদিক থেকে এগিয়ে আসছে। ভীষ্ম স্মরণ করলেন পতিতপাবন শ্রীমধুসূদনকে, সহসা সেই নিশ্চিদ্র অন্ধকারের বুক চিরে দেখা গেল এক আলোর রেখা। ভীষ্ম চোখ খুলে দেখলেন সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণ। ভীষ্ম বললেন,

—প্রভু, এই পাপীর প্রতি তোমার এত কৃপা? আমি স্মরণমাত্র তোমার দর্শন পেলাম। যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনকে আঘাত করতে গিয়ে তোমার গায়েও কত আঘাত করেছি, তোমার রক্তপাত ঘটিয়েছি, তুমি আমায় ক্ষমা করো প্রভু। আমার প্রার্থনা, উত্তরায়ণ পর্যন্ত আমি প্রাণ ধারণ করে থাকব। আমার অন্তিম সময়ে যেন তোমার চরণ দর্শন করতে পারি।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, তোমার ইচ্ছা পূরণ হবে। অন্তিম সময়ে আমি তোমায় দর্শন দেবো।

আবার অন্ধকারের বুকে মিলিয়ে গেল সেই আলোকরেখা। চারদিকে আবার নিশ্চিদ্র অন্ধকার।

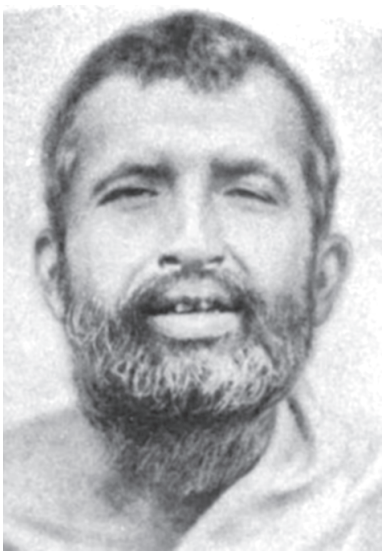

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবিতাবস্থায় লেখা রামকৃষ্ণের জীবনবৃত্তান্ত গ্রন্থ পুড়িয়ে দিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ

সুজিত রায়

অবতারণা

কোনও মহাপুরুষের জীবিতাবস্থায় তাঁর জীবনীগ্রন্থ লেখার ঘটনা অতি বিরল । শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের জীবিতাবস্থায় রামকৃষ্ণদেবের প্রথম জীবনীগ্রন্থ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত' রচনা করে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চরণাশ্রিত সেবক রাচমন্দ্র দত্ত সেই বিরল ঘটনাটা ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু এই বিরল ঘটনাটিই বিরলতর হয়ে উঠল যখন রামকৃষ্ণ-শিষ্য সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ, সম্পর্কে যিনি রামচন্দ্র দত্তের সম্পর্কিত ভাই এবং রামচন্দ্র দত্তকে ছোট থেকেই 'রামদা' বলে ডাকতেন, তিনিই এই জীবনীগ্রন্থের বিরোধিতা করলেন। আর এই সব ঘটনাই ইতিহাসে বিরলতম হয়ে উঠল সেদিন যেদিন স্বামী বিবেকানন্দ স্বহস্তে সেই জীবনীগ্রন্থ ছিঁড়ে আগুনে পুড়িয়ে দিলেন। বঙ্গের ধর্মাকাশে এ এক অনন্য ইতিহাস যার জল গড়িয়েছিল রামকৃষ্ণদেবের মৃত্যুর পরও তাঁর অস্থিকলসের দাবিদার হিসেবে দুই ভাইয়ের লড়াই। আজও তার সাক্ষী ভাগ হয়ে যাওয়া দেহাস্থি—একাংশ পূজিত হয় বেলুড় মঠে, অন্য অংশ ফুলবাগানে রামচন্দ্র দত্ত প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মন্দিরে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্তের মুখবন্ধ

তিনি মন্ত্র জানতেন না। তন্ত্রও জানতেন না। তিনি মা ভবতারিণীর সামনে দু' নয়নে আকুল অশ্রুবারি বর্ষণ করে আকুতি জানাতেন—"মা, আমি শাস্ত্র জানি না মা। আমি পণ্ডিত নই মা। আমি কিছুই জানি না, আমি কিছুই জানতে চাই না। তুই আমায় দয়া করবি কিনা বল? মা, আমার প্রাণ যায় মা! আমায় দেখা দাও। আমি অষ্টসিদ্ধাই চাই না, আমি লোকের নিকট মান চাই না, লোক আমায় জানুক, মানুষ আমায় জানুক এমন সাধন নেই মা। তুই আমায় দেখা দে.... দেখা দে" বলতেন আর কাঁদতেন। যেন সন্তানের কোলে গলা জড়িয়ে আদর পেতে চাইছে সন্তান।

মন্দিরে মন্ত্রোচ্চারণ নেই! ঢাক, ঢোল, কাঁসি, সানাইয়ের শব্দ নেই। এ কেমন পূজা? ক'জন সাধক এমন জন্ম নিয়েছেন যিনি চৈতন্যের রাজ্যে তুলে দিয়েছেন এক তরঙ্গ। চিদঘনমূর্তি মানবসত্তার

মধ্যে চৈতন্যবোধের তরঙ্গ। তাই ছিল তাঁর বর। তাঁর আশীর্বাদ। কাশীপুর উদ্যানবাটিতে কল্পতরু উৎসবে তাই ঐহিক প্রাপ্তিযোগের আশায় লোভাতুর মানুষ যখন ভিড় জমাতেন, তখন তিনি সবার মাথা ছুঁয়ে একটা কথাই বলতেন—''তোর চৈতন্য হোক। তোদের সবার চৈতন্য হোক।''

কী সেই চৈতন্য?

''প্রসুপ্ত-ভুজগাকারা আধার পদ্মবাসিনী।'' চতুর্দল পদ্ম। আদ্যাশক্তি। সবার শরীরে সুপ্ত কুলকুণ্ডলিনীরূপে, শীতঘুমে জড়ানো সাপের মতো।

তিনি বলতেন—যোগ পেতে হলে কামিনী-কাঞ্চনের মোহ ত্যাগ করতে হবে। যারা সাধারণ জীব তাদের মন লিঙ্গে, গুহ্যে, নাভিতে। আর যারা সাধক, তাদের মন কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করার অসীম অনন্ত সাধনায়। নাড়ী তিন—ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষম্না। সুষম্নায় অবস্থান ছয় পদ্মের। সবার নীচে রয়েছে মূলাধার। তারপর ক্রমান্বয়ে স্বাধিষ্ঠান মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা। সবে মিলে ষট্‌চক্র। কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হওয়ার পর সব পদ্ম পার হয়ে অবস্থান করে অনাহত পদ্মে। তখনই চৈতন্যের উদয় হয়। সাধকের জ্যোতিদর্শন হয়। সেটাই ব্রহ্মদর্শন। পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেই ব্রহ্মদর্শনের পথ চেনাতেন। লোকে বলত—যিনি রাম তিনিই কৃষ্ণ। একই শরীরে দুই অবতারের অবস্থান। তিনি রামকৃষ্ণ। তিনি চৈতন্যের আধার। তাই তিনি শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

হুগলী জেলার শেষ সীমা কামারপুকুরে যে শিশু জন্ম নিয়েছিল পিতা-মাতার অবচেতন মনের অলৌকিক চেতনার মধ্য দিয়ে সেই সেদিনের গদাধর, পরবর্তীকালে অধ্যাত্মজগতে বিপ্লব সৃষ্টিকারী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জীবন কি শুধুই অধ্যাত্মের আলোয় আলোকিত? না, তিনি নিজেই বলতেন—ব্রহ্মজ্ঞানের পর বিজ্ঞানের অধিষ্ঠান। অজ্ঞান–জ্ঞান–বিজ্ঞান। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন—''জ্ঞানী দেখেন, তিনিই কর্তা—সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার সবই তাঁর হাতে। বিজ্ঞানী দেখেন, তিনিই সব হয়ে রয়েছেন। কিছুই হারায়নি, বিলীন হয়নি। যা আছে এই বিশ্বেই আছে।

মিল হয়ে গেল বিজ্ঞান আর অধ্যাত্মের। অপরাবিদ্যার উত্তরণ হলো পরাবিদ্যায়। সে উত্তরণ মায়াতীত। সেই মায়াতীত অস্তিত্বের আধার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের গোটা জীবনটাই এক বিস্ময়, যেখানে পার্থিব-অপার্থিব সবকিছু মিলে মিশে একাকার।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতকার শ্রীম লিখে গেছেন, ''এই জগৎব্রহ্মাণ্ড মহাচিদাকাশে আবির্ভূত হইতেছে, আবার কালে লয় হইতেছে, মহাসমুদ্রে তরঙ্গ উঠিতেছে আবার কালে লয় হইতেছে। আনন্দ-সিন্ধুনীরে অনন্ত-লীলালহরী। এ লীলার আদি কোথায়? অন্ত কোথায়? তাহা মুখে বলিবার জো নাই—মনে চিন্তা করিবার জো নাই। মানুষ কতটুকু। তার বুদ্ধিই-বা কতটুকু। শুনিলাম মহাপুরুষেরা সমাধিস্থ হয়ে সেই পরমপুরুষকে দর্শন করেছেন— নিত্য লীলাময় হরিকে সাক্ষাৎকার করেছেন। অবশ্য করেছেন। কেননা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, তবে এ চর্মচক্ষে নয়, বোধ হয় দিব্যচক্ষু যাহাকে বলে তাহার দ্বারা, যে দিব্যচক্ষু পাইয়া অর্জুন বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন।'' আসলে তো সেই দর্শন উপলব্ধিমাত্র। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই উপলব্ধির কথা বলে গেছেন, শিখিয়ে গেছেন। গল্পের ছলে বলেছেন, ''মানুষ মনে করে আমরা তাঁকে (ব্রহ্মকে) জেনে ফেলেছি। একটা পিঁপড়ে চিনির পাহাড়ে গেছিল। এক দানা খেয়ে পেট ভরে গেল। আর এক দানা মুখে করে বাসায় নিয়ে যেতে লাগল। যাবার সময় ভাবছে, এবার এলে সব পাহাড়টি নিয়ে যাবে। ক্ষুদ্র জীবেরা এই সব মনে করে, জানে না ব্রহ্মবাক্য মনের অতীত ..... বেদে পুরাণে যা বলেছে, সে কীরকম জান? একজন সাগর দেখে এলে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে, কেমন দেখলে, সে লোক মুখ হাঁ করে বলে, ও! যা দেখলুম, কী হিল্লোল, কল্লোল। ব্রহ্মের কথাও সেরকম। বেদে আছে, 'তিনি আনন্দস্বরূপ সচ্চিদানন্দ।'

শ্রীরামকৃষ্ণের এই উপলব্ধির কথাই শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয়তম শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব থাকলেও শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্মবোধ সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন—''পরমহংসদেবকে আমি ভক্তি করি কারণ তিনি ধর্মীয় নৈরাজ্যের মরুযুগে নিজ উপলব্ধি দ্বারা আমাদের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের সত্যতা প্রমাণ করেছেন। তাঁর বিশাল শক্তি আপাত, সংঘাতশীল সাধনাসমূহকে নিজের মধ্যে মিলিত করতে পেরেছেন। তাঁকে ভক্তি করি, কারণ তাঁর আত্মার সারল্য চিরদিনের জন্য হতমান করেছে পণ্ডিত ও পুরোহিতদের আড়ম্বর ও বিদ্যাগর্বকে'' (সূত্র ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দ ও বিজ্ঞান চেতনা—অরূপরতন ভট্টাচার্য)।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের এই জ্ঞান ও বিজ্ঞান চেতনাকে, পরা ও অপরাবিদ্যার উপলব্ধিকে এবং ধর্মীয় সংস্কারমুক্ত উদার আধ্যাত্মিক চেতনাকে সে যুগে যাঁরা সঠিকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন তাঁদের একজন পরমপুরুষের ঘনিষ্ঠ শিষ্য রামচন্দ্র দত্ত। বাংলা সন ১২৯৭ সালে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীশ্রীচরণাশ্রিত সেবক রামচন্দ্র' নামে তিনি রচনা করেছিলেন 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবন বৃত্তান্ত'। রামচন্দ্র দত্তের নিজেরই উদ্যোগে গড়ে ওঠা কলকাতার কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যান থেকে বইটি সেবকমণ্ডলী কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল। অর্থাৎ আজ থেকে ১৩১ বছর আগে 'ইংরেজি ১৮৯০ সালে, শ্রীরামকৃষ্ণের দেহবসানের চার বছর পরে। এখানে উল্লেখ করা দরকার, শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত-র লেখক শ্রীম তথা শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১৮৮২ সালে ঠাকুরের সংস্পর্শে আসার পর থেকেই দৈনিক রোজ নামচার মতো ঠাকুরের কথা তথা বাণী তথা শিক্ষা লিখে রাখতে শুরু করেছিলেন। ডায়েরিটা বাংলায় লিখলেও প্রথমে তা ইংরেজি ভাষাতেই Gospel of Ramakrishna নামে প্রকাশিত হয়। বাংলাভাষায় কথামৃত রচনা আরম্ভ হয়েছিল 'জীবন-বৃত্তান্তর'-র লেখক রামচন্দ্র দত্তর অনুরোধেই। ১৯০২ সালে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের দায়িত্বে প্রকাশিত হয় প্রথম ভাগ। দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৯০২ সালে অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধান বর্ষে। তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ পায় ১৯০৮ সালে। ১৯১০ সালে প্রকাশিত হয় চতুর্থ খণ্ড। আর সর্বশেষ তথা পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সালে। এখানে উল্লেখনীয় যে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীগ্রন্থ হিসেবে একেবারে প্রথম পর্যায়ে প্রকাশিত

বইগুলির অন্যতম ছিল রামচন্দ্র দত্তের শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণপরমহংসদেবের জীবন বৃত্তান্ত।

কে ছিলেন এই রামচন্দ্র দত্ত? কেনই-বা তিনি পরমপুরুষের জীবনীগ্রন্থ লিখলেন?

রামচন্দ্র দত্ত ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের মা ভুবনেশ্বরী দেবীর ভ্রাতুষ্পুত্র। বিবেকানন্দের থেকে বারো বছরের বড়ো রামচন্দ্র দত্ত ছিলেন বিবেকানন্দের প্রিয় 'রামদা'। এই রামদা-র হাত ধরেই বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ সাক্ষাৎপর্ব সূচিত হয়েছিল।

রামচন্দ্র দত্ত

কলকাতার নারকেলডাঙা অঞ্চলে ১৮৫১ সালের ৩০ অক্টোবর রামচন্দ্র দত্ত মা তুলসীমণি দত্তের কোল আলো করে ইহধামে জন্ম নেন। তাঁর বাবা নৃসিংহপ্রসাদ দত্ত ছিলেন এক পরম বৈষ্ণব। ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল না রামচন্দ্রের। মাত্র আড়াই বছর বয়সে তিনি আচমকাই মাতৃহারা হন। ভুবনেশ্বরী দেবী তখন রামচন্দ্রকে মানুষ করার দায়ভার গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে রামচন্দ্রের বাবা দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করলে বালক রামচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পিতার দূরত্ব বেড়ে যায়। রামচন্দ্র গৃহত্যাগ করেন এবং প্রাথমিকভাবে এক আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নেন। কিন্তু তাঁর দিনের অধিকাংশ সময়ই কাটত বিভিন্ন আশ্রমের সেবাকার্যে ও সন্ন্যাসীদের সাহচর্যে। অতি অল্প বয়সেই তিনি আমিষ খাদ্য ত্যাগ করে সম্পূর্ণভাবে নিরামিশাষী হয়ে যান। এই কঠিন সময়ে তাঁর পাশে ছিলেন একমাত্র ভুবনেশ্বরী দেবী ও তাঁর পরিবার।

রামচন্দ্র দত্ত ছিলেন জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ ইনস্টিটিউশনের ছাত্র। এখন তা স্কটিশ চার্চ কলেজ নামে বিখ্যাত। যদিও তিনি স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেছিলেন ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুল থেকে। বিজ্ঞানে স্নাতক রামচন্দ্র সেই বছরেই গভর্নমেন্ট কুইলাইন এক্সামিনারের সহকারি হিসেবে সরকারি কাজে যোগ দেন।

আর্থিক সামর্থ্যে কিছুটা সুরাহা হলে রামচন্দ্র মধ্য কলকাতায় একটি পুরনো বাড়ি কেনেন এবং কৃষ্ণপ্রেয়সী দেবীর সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন।

একাধারে অধ্যাত্মতত্ত্বে আকর্ষিত এবং অন্যধারে চরম বিজ্ঞান মনস্ক ইংরেজ বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কাজ করাকালীন তিনি নিজস্ব আগ্রহে কুড়চি গাছের ছাল থেকে রক্তআমাশা রোগের প্রতিষেধক তৈরি করেন এবং তা সরকারের অনুমোদনও লাভ করে। শুধু তাই নয়, তাঁর তৈরি ওষুধ চিকিৎসকরা রোগীদের ওপর প্রয়োগ করে সাফল্যও পান। রামচন্দ্রের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। ইংল্যান্ডের কেমিস্ট অ্যাসোসিয়েশন তাঁকে সদস্যপদ দিয়ে সম্মান জানায়। সরকার তাঁকে পদোন্নয়ন দিয়ে সরকারি রাসায়নিক পরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ করে। রামচন্দ্র দত্ত ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপনাও করেছেন। অধ্যাপনা করাকালীন তিনি আধুনিক বিজ্ঞানচর্চার প্রতি বিশেষভাবে আকর্ষিত হয়ে পড়েন। একদা অধ্যাত্মতত্ত্বে বিশ্বাসী রামচন্দ্রের মনে হয়—এই বিশ্বচরাচর সৃষ্টির পিছনে কোনো ঈশ্বর নেই। আছে বিজ্ঞান। এনিয়ে বিভিন্ন মহলে বিস্তর তর্কেও অংশ নিতেন তিনি।

মানসিক পরিণতির এরকম একটি সন্ধিক্ষণেই মৃত্যু হয় তাঁর ছোটো মেয়ে এবং এক ভাগনির। দুজনেই কলেরা রোগে মারা যান। চূড়ান্ত হতাশায় দগ্ধ শ্রীরামচন্দ্র দত্ত পুনরায় বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের মধ্যে আশ্রয় খুঁজতে থাকেন। কিন্তু শান্তি তাঁর করায়ত্ত হচ্ছিল না কিছুতেই। আশাহত রামচন্দ্রের পাশে এসময় হাত বাড়িয়ে দিলেন বন্ধুবর গোপালচন্দ্র মিত্র। ১৮৭৯ সালের ১৩ নভেম্বর গোপাল এবং আর এক আত্মীয় মনমোহন মিত্রের সঙ্গে যান দক্ষিণেশ্বরে। পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে। এই সাক্ষাতের পর শ্রীরামচন্দ্র দত্তের জীবন সম্পূর্ণভাবে এক নতুন বাঁকের মুখে এসে দাঁড়াল। প্রথমবার সাক্ষাতের কথা স্মরণ করে রামচন্দ্র দত্ত জীবনবৃত্তান্তের ভূমিকায় লিখেছেন, ''আমরা পাছে প্রতারিত হই, এই ভাবনা বিলক্ষণ ছিল। মানুষের কর্তব্য কী তাহাও একপ্রকার পাঁচজনের মতো স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম। বিজ্ঞান, দর্শনাদি দ্বারা বিশুদ্ধ ভাববিশিষ্ট হইলে যে প্রকারে ধর্ম হইবার সম্ভাবনা, তাহাও জানিয়া রাখিয়াছিলাম, কী করিতে আছে এবং কী করিতে নাই তাহাও জানা ছিল। কিন্তু কী করিব। ঈশ্বর নাই বলিয়া বিশ্বাস ছিল এবং স্বভাব ব্যতীত আর কিছু স্বীকার করা যায় না, তারা একই কথা বলিয়া ধারণা দিল। তিনি যে সকল বিকৃত করিয়া দিলেন। আমাদের বিদ্যা বুদ্ধি আর তাঁহার নিকট স্থান পাইল না, পূর্বে যে সকল সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক বলিয়া ধারণা হইয়া গেল। তাঁহাকে যাহা বলিবার নয়, আমরা তাহাও বলিয়া ফেলিলাম।''

শ্রীরামকৃষ্ণ সকাশে রামচন্দ্রের যাতায়াত বেড়ে গেল। তাঁর অশান্ত হৃদয় ধীরে ধীরে শান্ত হতে থাকে। পরমহংসদেবকে তাঁর মনে হয়, তিনিই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। তিনিই পূর্ণব্রহ্ম। রামকৃষ্ণদেবের অবতাররূপ মানুষের কাছে তখনও প্রকাশ্য নয়। অনেকের কাছে তাঁর পরিচয় তখন 'পাগল'। ঠিক যেমনটি ধরে নিয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত বা বিলে, ভবিষ্যতে যিনি রামকৃষ্ণ সান্নিধ্যেই স্বামী বিবেকানন্দ হতে পেরেছিলেন। ফলত রামচন্দ্র দত্তের এই রামকৃষ্ণ-প্রীতি অনেকেই ভালো চোখে দেখতেন না। নরেন্দ্র দত্তও না। রামচন্দ্র তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বরে একরকম জোর করেই। বলেছিলেন, 'ঠাকুরের কাছে গেলেই ঠাকুর রসগোল্লা খাওয়ান। তোকে ওর কথা শুনতে হবে না। কিন্তু রসগোল্লা খেতে তো পারবি।' রসগোল্লার লোভেই নরেন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গাতীরে রামকৃষ্ণের সেই ছোটো ঘরটিতে। বিবেকানন্দ বলে গেছেন—''রামকৃষ্ণদেব মনে করতেন, আমি নররূপী নারায়ণ। পৃথিবীর দুর্গতি নাশ করার জন্যই নাকি আমার জন্ম। বলতেন, আমি সেই পুরাতন ঋষি। আমি কিন্তু এসব শুনতে বা জানতে দক্ষিণেশ্বরে যাইনি। গিয়েছিলেম রসগোল্লার লোভে। আমাদের এক আত্মীয় রামকৃষ্ণের ভক্ত ডাক্তার রামচন্দ্র দত্ত বলেছিলেন, চল দক্ষিণেশ্বর। ভট্টাচার্যিমশাই খুব ভালো রসগোল্লা বানান। ১৮৮১ সালের নভেম্বরে

রসগোল্লার লোভে গিয়ে যে নতুন রসে হাবুডুবু খাব, তা ভাবিনি" (সূত্র : বিবেকানন্দের স্বেচ্ছামৃত্যুর ধারাভাষ্য ঃ সুজিত রায়, পৃষ্ঠা ঃ ৩৫)। রামচন্দ্র দত্তও এমন না ভেবেই দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছেছিলেন। ঘরে ফিরেছিলেন অন্য মানুষ হয়ে।

দক্ষিণেশ্বরে যেদিন নরেনকে প্রথম দেখলেন রামকৃষ্ণ, সেদিন একঘর ভর্তি লোকের সামনে জিজ্ঞেস করলেন—''তুই কি ঘুমোবার আগে একটা জ্যোতি দেখিস?''

নরেন জবাব দিলেন—''হ্যাঁ দেখি।''

ঠাকুর বললেন—''বাঃ। সব মিলে যাচ্ছে। এ ধ্যানসিদ্ধ— জন্ম থেকেই ধ্যানসিদ্ধ। দেখ, দেখ, দেবী সরস্বতীর জ্ঞানালোকে নরেন কেমন জ্বলজ্বল করছে।''

একদিন হাঁটতে হাঁটতেই নরেন চলে গেলেন দক্ষিণেশ্বর। ঠাকুর তাঁকে দেখেই কেমন আবিষ্ট হয়ে পড়লেন। অস্পষ্ট স্বরে কী সব বলতে বলতে তাঁর ডান পা ছোঁয়ালেন নরেনের বুকে। মুহূর্তে নরেনের মনে হলো, ঘরের দেওয়ালগুলো সমেত ঘরের সমস্ত বস্তু সবেগে ঘুরতে ঘুরতে কোথায় লীন হয়ে যাচ্ছে—''সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে আমার আমিত্ব যেন এক সর্বগ্রাসী মহাশূন্যে একাকার হয়ে ছুটে যেতে চলেছে।' (সূত্র ঃ বিবেকানন্দের স্বেচ্ছামৃত্যুর ধারাভাষ্য ঃ সুজিত রায়, পৃষ্ঠা : ৯০)। তখন থেকেই নরেনের ভাবনা বদলে গেল। বুঝলেন, সত্যসত্যই রামকৃষ্ণ ঈশ্বরার্থে সর্বত্যাগী। ....নির্বাক হয়ে ভাবতে লাগলেন, উন্মাদ হলেও ঈশ্বরের জন্য ওইরূপ ত্যাগ জগতে বিরল ব্যক্তিই করতে সক্ষম, উন্মাদ হলেও ওই ব্যক্তি মহাপবিত্র, মহাত্যাগী এবং ওইজন্য মানব হৃদয়ের শ্রদ্ধা, পূজা ও সম্মান পাওয়ার যথার্থ অধিকারী। নরেন্দ্রনাথের সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত জীবনে রামকৃষ্ণের এই প্রভাবে ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন মা ভুবনেশ্বরী দেবী। তিনি নিজেই ছুটে গিয়েছিলেন রামকৃষ্ণের কাছে কাশীপুর উদ্যানবাটিতে। জিজ্ঞেস করেছিলেন—''বিলু কি আর সংসারে ফিরবে না?'' ভুবনেশ্বরী দেবী একই প্রশ্ন করেছিলেন রামচন্দ্র দত্তকেও। রামচন্দ্র আশ্বস্ত করেছিলেন, আপনাকে ছেড়ে ও যাবে কোথায়?'' নরেন্দ্রনাথ মাকে ছাড়েননি। কিন্তু ঘরেও ফেরেননি। আর রামচন্দ্র দত্ত ফিরেও ছিলেন না ফেরার দেশেই। বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, বিজ্ঞান গবেষক রামচন্দ্র দত্ত প্রকাশ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব প্রচার করে বেড়াতেন। এজন্য তিনি সমাজের বহু অংশে বহুবার পরিহাসের শিকার হয়েছেন। কিন্তু তিনি তাঁর পথেই হেঁটেছেন নির্দ্বিধায়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও উপদেশাবলী অবলম্বনে লিখেছেন, তত্ত্বাসার, তত্ত্বপ্রকাশিকা। শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ সংবলিত বই ও পত্রিকা ছেপে বিনামূল্যে বিতরণ করতেন। বলতেন ঠাকুর স্বয়ং অবতার। রামকৃষ্ণ বলতেন—গৃহীকে পাঁকাল মাছের মতো থাকতে হবে অর্থাৎ পাঁকে থাকলেও পাঁক গায়ে লাগবে না। রামচন্দ্রের গায়েও কোনো পাঁক লাগেনি। কারণ তাঁর মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছিল চারটি উচ্চভাব—নিষ্ঠা, কৈবল্যপ্রেম, পরাভক্তি ও অব্যাভিচারিণী ভক্তি।

এ প্রসঙ্গে ঠাকুর আরও বলতেন—গৃহীর অর্থ হলো সাঁকোর নীচে জল। অর্থাৎ সাঁকোর নীচে জল যেমন একদিক দিয়ে আসে আর একদিক দিয়ে চলে যায়, তেমনি সংসারীও একদিকে অর্থ উপার্জন করবে আর একদিকে দান করবে। ঠাকুরের এই ব্যাখ্যা রামচন্দ্র তাঁর জীবনে সার্থক করে তুলেছিলেন।

গুরুগতপ্রাণ রসায়নবিদ রামচন্দ্রের সেই যুগে বেতন ছিল মাসে দুশো টাকা। সেই টাকার বৃহৎ অংশই ব্যয় করতেন দরিদ্র সেবায়। ঠাকুরের অনুমতি নিয়ে রামচন্দ্র কাঁকুড়গাছিতে একটি বাগানবাড়ি কেনেন। ঠাকুর সেখানে যান এবং পূর্ণানন্দ চিত্তে অবস্থান করে মন্তব্য করেছিলেন—''রাম, এ যে যোগের স্থান। এখানে একটি পঞ্চবটি স্থাপন কর।'' তখন থেকেই এই বাগানবাড়ি সেজে ওঠে ও পরিচিতি পায় যোগোদ্যান হিসেবে। পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবসানের পর তাঁর অস্থিরক্ষা নিয়ে একটি সমস্যা দেখা দিল। কাশীপুর উদ্যানবাটি ছিল ভাড়া বাড়ি। ঠাকুর সেখানেই দেহরক্ষা করলেও তাঁর দেহাবশেষ সংবলিত অস্থিকলস রাখার সমস্যা দেখা দিল। এর কারণ ছিল রামচন্দ্র দত্ত এবং আরও কয়েকজন গৃহী শিষ্যের মধ্যে ঘটে যায় একটি পুরনো ঘটনা।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের গলায় ক্যানসার রোগের প্রভাব তখন স্পষ্ট। নিয়মিত চিকিৎসার সুবিধা এবং গঙ্গা তীরবর্তী অঞ্চল থেকে সরিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে আসা হয়েছে ভাড়ায় নেওয়া কাশীপুর উদ্যানবাটিতে। মা সারদাও সঙ্গে এসেছেন। এখানে ঠাকুরের সেবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানেরা অর্থাৎ সন্ন্যাস নেওয়া শিষ্যগণ। এদের মধ্যে এগারো জন—নরেন্দ্রনাথ (বিবেকানন্দ), রাখাল, বাবুরাম, নিরঞ্জন, যোগীন্দ্র, গোপালদাদা, শশী, কালী, লাটু, তারক ও শরৎ উদ্যানবাটিতেই অবস্থান করতেন। বাকি শিষ্যরা বাড়ি থেকেই যাতায়াত করতেন।

সব মিলিয়ে ঠাকুরের শিষ্যের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় উদ্যানবাটির খরচও ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছিল। মা সারদাও পরে বলেছিলেন— ''তখন বাগানে খুব খরচ হয়। তিনটে রান্না। ঠাকুরের একটা, নরেনদের (ত্যাগী শিষ্যদের) একটা আর অপর সবার একটা। চাঁদা করা হলো টাকার জন্য। তাই চাঁদার ভয়ে আবার একজন ভেগে গেল।

আসলে গৃহী সন্তানরা সকলেই ছিলেন চাকুরীজীবী গৃহস্থ। ঠাকুরের সেবার দায় তাঁরাই বহন করতেন সংসারের খরচপত্র কমিয়ে। ব্যয়ভার এমন জায়গায় পৌঁছেছিল যে রামচন্দ্র দত্ত একদিন ত্যাগী সন্তানদের বললেন—''এখানে সকলের থাকার কী দরকার? দুজন স্থায়ীভাবে থাকুক। বাকিরা বাড়ি থেকে যাতায়াত করুক। তাহলেই খরচপত্র সামলানো সম্ভব হবে।'' এতে ত্যাগী সন্তানরা ক্ষুব্ধ হন। নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বাধীন ত্যাগী সন্তানরা এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে অনুযোগ করেছিলেন। ঠাকুর তখন নরেনকে বলেন—''তুই যেখানে যাবি আমিও সেখানে যাব। তুই যেমন রাখবি আমি তেমনই থাকব।'' নরেন উত্তর দিয়েছিলেন— ''আপনাকে আমরা মাথায় করে রাখব। দরজায় দরজায় ভিক্ষে করে খাওয়াব।'' ঠাকুর খুশি হয়ে বলেছিলেন— 'ভিক্ষান্ন বড় পবিত্র।' নরেন তৎক্ষণাৎ কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে ভিক্ষা করতে বেরিয়ে পড়েন। তবে সবার আগে ভিক্ষা নেন মা সারদার কাছ থেকে। সারাদিন ভিক্ষা করে অর্জিত চাল, ডাল, সবজি সারদা মায়ের হাতেই তুলে দেন। মা রেঁধেবেড়ে সন্তানদের খাইয়েছিলেন।

ঠাকুর তাঁদের সিদ্ধান্তে সায় দিয়েছেন দেখে নরেন্দ্রনাথ একটি কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি নিয়ম করে দেন—ঠাকুরের সেবার জন্য কোন অর্থ গৃহী ভক্তদের কাছ থেকে নেওয়া হবে না এবং তাঁরা ঠাকুরের কাছেও যেতে পারবেন না। গৃহীভক্তদের মধ্যে তখন নিয়মিত আসা যাওয়া করতেন মাস্টারমশাই, গিরিশ ঘোষ, অতুল, রামচন্দ্র প্রমুখ। দরজা আগলে বসে থাকতেন নিরঞ্জন। কেউই রামকৃষ্ণ সকাশে যেতে পারতেন না। দুই শ্রেণীর ভক্তদের মধ্যে গড়ে উঠল অদৃশ্য বিচ্ছেদের দেওয়াল। ঠাকুর বুঝলেন— গৃহী সন্তানরা তো নিরুপায় হয়েই বলেছেন মিতব্যয়ী হওয়ার জন্য। তবু তাদের আরও উদার ও সংযমী হওয়া দরকার। তিনি তিনদিন পর গৃহী ভক্তদের ডেকে পাঠালেন। তাঁরা এলে সন্ন্যাসী সন্তানদেরও ডাকলেন। দু'পক্ষকেই নানা উপাখ্যান শোনালেন এবং তার মাধ্যমেই বুঝিয়ে দিলেন—দু'পক্ষের মধ্যেই তখনও ত্রুটি ও চিন্তার অসম্পূর্ণতা রয়েছে। ফলত দু'পক্ষই ঠাকুরের কাছে ক্ষমা চেয়ে মিটমাট করে নেন। পরে ঠাকুর দু'ধরনের শিষ্যদেরই সমগোত্রীয় করে দেন এবং শেষপর্যন্ত সেই ভাবধারায় গড়ে ওঠে 'রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ।' তবুও দীর্ঘদিন রামচন্দ্র দত্ত ও নরেন্দ্রনাথের মনে অভিমান বজায় ছিল। তারই ফলশ্রুতি হলো ঠাকুরের চিতাভস্ম ভাগ। তখন রামচন্দ্র দত্ত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে বললেন—ঠাকুরের অস্থিকলস যোগোদ্যানে সুরক্ষিত রাখব। সেই অস্থিকলসের জন্য নির্মাণ করব রামকৃষ্ণ মন্দির। কিন্তু রামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্যরা এমনকী নরেন্দ্রনাথ নিজেও গৃহী সন্ন্যাসী রামচন্দ্র দত্তের এই আগ্রহে সায় দিলেন না। তখন স্থির হলো কিছুটা চিতাভস্ম পৃথক করে নিয়ে যাওয়া হবে যোগোদ্যানে। একটি পৃথক মাটির কলসীতে। সেই অস্থি জন্মাষ্টমীর সকালে নগর সংকীর্তন করে নিয়ে গিয়ে স্থাপন করা হলো যোগোদ্যানে। সেই নগরকীর্তনে শোকস্তব্ধ নাট্যাচার্য এবং রামকৃষ্ণশিষ্য গিরীশ ঘোষ চৈতন্যলীলা নাটকের বিখ্যাত গানটি গাইতে গাইতে গিয়েছিলেন যোগোদ্যানে— ''হরি মন মজায়ে লুকোলে কোথায়? আমি ভবে একা, দাও হে দেখা, প্রাণসখা রাখ পায়ে। কালশশী বাজালে বাঁশি, ছিলাম গৃহবাসী, করলে উদাসী, কুল ত্যাজি হে অকুলে ভাসি— হৃদবিহারী কোথায় হে হরি, পিপাসী প্রাণ তোমায় চায়।'' রামচন্দ্র দত্তের উদ্যোগেই সেই অস্থিকলসকে সম্বল করে গড়ে ওঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির। রামকৃষ্ণ নামাঙ্কিত রামকৃষ্ণের উদ্দেশে নিবেদিত এটিই হলো প্রথম মন্দির।

রামচন্দ্র দত্তের কাছে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন স্বয়ং ঈশ্বর প্রেরিত সাধক।

১৮৮৫ সালে তিনিই প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর একটি সংকলন রচনা করেন। অর্থাৎ শ্রীম রচিত শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত প্রকাশিত হওয়ার আগেই এই সংকলনটি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তবে তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবন বৃত্তান্ত।

ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত সৎ, দানশীল ও শৃঙ্খলাপরায়ণ হলেও ১৮৯৮ সালে আমাশা রোগের পাশাপাশি তাঁর শরীরে ক্রনিক ডায়াবেটিস ও কার্বাঙ্কল দেখা দেয়। সেখান থেকেই শুরু হয়ে যায় হৃদরোগের সমস্যা এবং ক্রনিক অ্যাজমা বা শ্বাসকষ্টজনিত অসুখ। বছর খানেকের মধ্যেই ১৮৯৯ সালের ১৭ জানুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয় মাত্র ৪৭ বছর বয়সে। তাঁর শেষ ইচ্ছেকে সম্মান দিয়ে তাঁর চিতাভস্মকে রাখা হয় যোগোদ্যানের শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দিরের পাশেই। আশ্চর্যজনক ঘটনা হলো—শ্রীরামকৃষ্ণ, রামচন্দ্র দত্ত এবং স্বামী বিবেকানন্দ—এই তিন সাধক মহাপুরুষের জীবনধারা যেন একই সুতোয় বাঁধা। শ্রীরামকৃষ্ণই ছিলেন রামচন্দ্র ও বিবেকানন্দের চালক শক্তি। একজন গৃহী ভক্ত। অন্যজন সন্ন্যাসী শিষ্য। রামকৃষ্ণ ভাবধারার এই দুটি ধারাকে দত্ত পরিবারের একই মায়ের স্তন্য পান করে বড়ো হয়ে ওঠা দুই সন্তানের মাধ্যমে কোন জাদুবলে প্রতিষ্ঠা করে গেলেন ঠাকুর তা ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। শুধু কাকতলীয় ঘটনা হিসেবে মানতে মন চায় না। আরও অবাক হতে হয় যখন দুই ধারার দুই শিষ্যই অতি অল্প বয়সে দেহরক্ষা করলেও কী অনবদ্য অবদান রেখে গেলেন এ বিশ্বে। রামচন্দ্র বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মকে মিলিয়ে দিলেন বুঝিয়ে দিতে যে গোটা বিশ্বই চলছে একজনেরই নির্দেশে। আর বিবেকানন্দ বুঝিয়ে গেলেন—সমাজ ও ধর্ম পরস্পরের পরিপূরক। বিশ্বের সকল বস্তুকে নিজের স্বরূপ দর্শনই প্রকৃত শিক্ষালাভ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবন বৃত্তান্ত বইটি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের সেইসব অভূতপূর্ব এবং অদৃষ্টপূর্ব কার্যকলাপের বিবরণ ও ব্যাখ্যা—'তিনি কখনো গভীর জ্ঞানসম্পন্ন গুরুরূপে, কখনো বরদাতা ইষ্টরূপে, কখনো স্নেহময়ী মাতারূপে, কখনো ন্যায়বান পিতারূপে প্রকাশ পাইয়াছেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধক চরিত্রের এই যে বিচিত্র বহুমুখী দর্শনের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রেখেও সব দর্শনকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অবদান বলে ব্যাখ্যা করা কাজটি সহজ নয়। রামচন্দ্র দত্ত তাঁর শিক্ষা ও চেতনার গভীরতা দিয়ে সেই দর্শনকে চিনতে পেরেছিলেন এবং সেই মহান জীবনকাহিনি লিপিবদ্ধ করতে পেরেছিলেন।

তিনি নিজেই বলে গেছেন, 'তিনি (রামকৃষ্ণ) গৃহী শিষ্যদের উপস্থিতিতে গৃহত্যাগী শিষ্যদের বিষয়ে কথা বলতেন না, আবার গৃহত্যাগী শিষ্যদের উপস্থিতিতে গৃহী শিষ্যদের কথা বলতেন না। কিন্তু যখন উভয় গোষ্ঠীই উপস্থিত থাকতেন, মাঝেমাঝে উভয়েরই সমালোচনা করতেন—এভাবে দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে বীরত্ব তথা বীরভাব-এর অনুভূতি বজায় রাখতেন।' স্বয়ং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ ছাড়া এ ধরনের জীবনীগ্রন্থ রচনা অসম্ভব।

এতৎসত্ত্বেও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবন বৃত্তান্ত বইটির লেখক রামচন্দ্র দত্ত সম্পর্কে একটি প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। তা হলো, প্রাথমিকভাবে একজন বিজ্ঞান-সচেতন এবং বিজ্ঞান সাধক হয়েও রামচন্দ্র দত্ত শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাদর্শে এত গভীরভাবে মোহিত হলেন কেন?

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে ঘিরে এখনও পর্যন্ত যত গবেষণা হয়েছে, যত বক্তৃতা হয়েছে এবং যত বই লেখা হয়েছে, তার একটা অংশে তাঁকে ধর্মগুরু ছাড়াও নীতি শিক্ষক, লোক শিক্ষক এবং কুসংস্কার বিরোধী এক আধুনিক মানসিকতার ব্যক্তি হিসেবে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। এই যে অন্য শ্রীরামকৃষ্ণ, সেই রামকৃষ্ণ চরিত্রের একটা বড়ো দিক হলো, তিনি ছিলেন প্রকৃতিবিদ বা আরও একটু স্পষ্ট করে বললে বলতে হয় তিনি ছিলেন প্রকৃতি বিজ্ঞানী। অরূপরতন ভট্টাচার্যের

'শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দ ও বিজ্ঞান চেতনা' গ্রন্থে লেখা হয়েছে—'দৃশ্যজগতে বিজ্ঞানের যে সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা আছে, তা ধরা পড়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের চোখে'। অর্থাৎ তিনি চেতন শক্তিকে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সীমাবদ্ধ পরিধিরও বাইরের এক জগতে যেটি এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের উৎসমুখ। আধুনিক বিজ্ঞানও তো সেই কথাই বলে যে, 'স্থূল ক্রমশঃ সুক্ষ্ম থেকে সুক্ষ্মতর পদার্থে লয় পায়, শেষ পর্যন্ত চৈতন্যপ্রাপ্তিতে তার পরিণতি ঘটে।'

আজকের কোয়ান্টাম তত্ত্ব তো সেই চেতনের লক্ষ্যেই গবেষণার কাজের প্রধানতম উপকরণ হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞান মানেই তো বিশেষভাবে জানা। অজ্ঞানতা ও জ্ঞানের পরিসীমা পার হলে তবেই তো বিজ্ঞানে পৌঁছানো সম্ভব। তাই 'ঈশ্বর আছে' এই বোধ যদি জ্ঞান হয় তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণের মতে সেই ঈশ্বরের সঙ্গে বাৎসল্যভাব, সখ্যভাব, দাস্যভাব ও মধুরভাব নিয়ে আনন্দ করাই হলো বিজ্ঞান। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজমুখে বলেছেন—''জ্ঞান অজ্ঞানের দুটি কাঁটা ফেলে দিলে হয় বিজ্ঞান।'' উদাহরণ দিয়েছেন যে প্রথিতযশা প্রবাদটির কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। পায়ে কাঁটা বিঁধলে কাঁটা দিয়েই তা তুলতে হবে। দুটি কাঁটা হলো অজ্ঞান ও জ্ঞান। তবেই সুস্থতা অর্থাৎ বিজ্ঞানকে জানা যাবে। শ্রীরামকৃষ্ণই তো প্রকৃত প্রকৃতিবিজ্ঞানী। তাই তো মাছ কেন এলাচের খোল খেলো না আর চড়ুইপাখি কেন ময়দা ছুঁলো না তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন—''ওদের জ্ঞান বিজ্ঞানের জ্ঞান।''

রামচন্দ্র দত্ত বিজ্ঞানের জ্ঞান নিয়েই গিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ সকাশে। ফিরে এলেন আর এক বিজ্ঞানের জ্ঞান নিয়ে। সেখানে বিজ্ঞান আর অধ্যাত্মে কোনও সংঘাত নেই। দুই-ই মিলেমিশে একাকার। ফলত বিজ্ঞানসাধক, ওষুধ আবিষ্কারক চিকিৎসাবিদ রামচন্দ্র দত্ত বুঝে নিতে ভুল করেননি যে কুলকুণ্ডলিনী জাগরণ বা যোগের দ্বারা নির্বিকল্প সমাধিলাভ একটি বিজ্ঞান ছাড়া কিছুই নয়।

অতীতে অনেকেই বিশ্বাস করতেন এবং আজও করেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ মেসমারিজম অর্থাৎ অন্যের চেতনশক্তির ওপর নিজস্ব চেতনশক্তির প্রভাব সৃষ্টি করে অন্যদের মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশিষ্ট থেরাপিউটিশিয়ান এই পদ্ধতিটিকে অ্যানিমাল ম্যাগনেটিজম হিসেবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যিই তা করতেন কিনা তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে কিন্তু একথা মানতে দ্বিধা করা তো উচিত নয় যে সেটাও একটি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। প্রয়োজনবোধে ইতিবাচক মানসিকতায় যদি কাউকে সুস্থাপনের প্রতি টেনে নিয়ে আসা যায় তাতে আপত্তি কীসের? তবে এসব বিতর্কিত বিষয়কে উত্থাপন না করেও বলা যায়, রামচন্দ্র দত্ত শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন বৃত্তান্তে এমন অনেক ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন, যার ব্যাখ্যা শুধু বিজ্ঞানই করতে পারে। অতএব তিনি যখন জীবন-বৃত্তান্ত লিখেছেন তখন অন্যান্য শিষ্যদের মতো ভাবে ভেসে গিয়ে তা লেখেননি। বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাভাবনা দিয়েই ঘটনাগুলিকে বিচার করেছেন। এ নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যদের একাংশ তাঁর রচিত জীবন বৃত্তান্তকে তীব্র সমালোচনা করতেও দ্বিধা করেননি। শোনা যায়, জীবন-বৃত্তান্তের অষ্টম, নবম ও দশম পরিচ্ছেদে উল্লিখিত ঘটনাগুলি নিয়ে রামকৃষ্ণ-শিষ্যদের একটা অংশ রামচন্দ্র দত্তকে ভৎর্সনা করতেও দ্বিধা করেননি। যদিও রামচন্দ্র দত্ত সেই ভৎর্সনাকে গ্রাহ্য করেননি। তিনি যা লিখেছেন তা বিশ্বাস থেকেই লিখেছেন। কোনও ভাবাবেগে ভেসে গিয়ে কিন্তু লেখেননি।

রামচন্দ্রের লেখার বহু অংশে তাই বিজ্ঞানী রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রতীয়মান হয়েছেন। লোকশিক্ষক রামকৃষ্ণ চরিত্র স্পষ্টত ধরা পড়েছে এবং অবশ্যই প্রমাণিত হয়েছে, শ্রীরামকৃষ্ণ অধ্যাত্মকেও বিশ্লেষণ করেছেন বিজ্ঞান দিয়েই।

পরিশেষে বলা দরকার—শ্রীরামকৃষ্ণ চর্চার ক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত যে কয়েকশো বই প্রকাশিত হয়েছে, অজস্র প্রবন্ধাদি লেখা হয়েছে, রামচন্দ্র দত্ত লিখিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত বইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে। বর্তমানে বইটি প্রায় অদৃশ্য। অথচ এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বই থেকে পাঠকদের বঞ্চিত করা সমীচীন নয়—এই চিন্তা থেকেই বইটি নতুনভাবে প্রকাশের কথা ভাবা হয়। দে পাবলিকেশনস-এর কর্ণধার তপন দে এই ভাবনাকে গুরুত্ব দেন এবং বইটি সম্পাদনার দায়িত্ব আমার ওপর হস্তান্তর করেন।

তবে খুব স্পষ্টতই বলি, ও ধরনের বইয়ের মূল অংশে বিশেষ কিছু সম্পাদনা করা সঙ্গত নয় এ ভাবনা মাথায় রেখেই মূল রচনার কোনো অংশেই কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি। এমনকী কোনো অংশ বিধৃত বা সংকুচিতও করা হয়নি। রামচন্দ্র দত্ত যেখানে যেমন সেযুগে প্রচলিত বানান ব্যবহার করেছেন, তাই-ই রক্ষা করা হয়েছে। মূল বইটির প্রথম পৃষ্ঠা এবং অবতরণিকাও পুরোপুরি রক্ষা করা হয়েছে। মূল বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ২০৮। নব সম্পাদিত বইতেও একেবারে শেষাবধি প্রকাশ করা হয়েছে অবিচ্ছিন্নভাবে। এমনকী মূল বইটির শেষাংশে পরমহংস-গীত গান হিসেবে যতগুলি গান রামচন্দ্র দত্ত প্রকাশ করেছিলেন তার সবকটিই নতুনভাবে সম্পাদিত বইতে রাখা হয়েছে। আমাদের এই উদ্যোগকে রামকৃষ্ণ পরম্পরার চর্চাকারী ব্যক্তিগণ আশা করি স্বাগত জানাবেন। যদি কোথাও সামান্যতম অংশও মূল বই থেকে ব্যত্যয় হয়ে থাকে, তাহলে তা অনিচ্ছাকৃত অথবা মুদ্রণজনিত প্রমাদ হিসেবে মেনে নিতে অনুরোধ করব।

পরিশেষে, মূল বইয়ের ভাব ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এই মুখবন্ধে যা বলা হলো তার প্রমাণ হিসেবে বইটির একটি ক্ষুদ্র অংশ উপস্থাপন করেই মুখবন্ধের ইতি টানব। রামচন্দ্র দত্ত লিখছেন—'ঈশ্বর-জ্ঞান লাভ করিবার জন্য বেশী বুদ্ধি, বেশী বিদ্যা, বেশী জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। পরমহংসদেব তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। এই শিক্ষা দিবার জন্য তিনি আসিয়াছিলেন। যদিও তাঁহাকে আমরা অবতার বলিলাম, কিন্তু সে কথা অন্যে এক্ষণে নাও বলিতে পারেন। তাঁহাকে একজন মনুষ্য বলিয়া, তাঁহার জীবনের স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন কি সুন্দরভাবে সংঘটিত হইয়াছিল, যদ্যপি কেহ, তাহাই আদর্শ স্বরূপ রাখিয়া দেন, তাহা হইলেও কল্যাণের ইয়ত্তা থাকিবে না। এতদ্বারা এ কথা তিনি স্পষ্ট বুঝিবেন যে, ঈশ্বরের হাতে পড়িয়া থাকিলে তিনি অতি সামাণ্য বক্তিকেও অতি উচ্চ স্থান প্রদান করিতে পারেন।" (পৃষ্ঠা সংখ্যা .....) অধ্যাত্মতত্ত্বের এর চেয়ে সহজ ব্যাখ্যা আর কী হতে পারে!

(লেখক সাংবাদিক এবং বহু গ্রন্থের প্রণেতা)

বাঙ্গালি হিন্দু এক ভয়াবহ সন্ধিক্ষণে

তথাগত রায়

একটা সময় ছিল, যখন আমরা সকালে বা বিকেলে শাখার মাঠে যেতাম, আধঘণ্টা শারীরিকের পর আধঘণ্টা বৌদ্ধিক সত্র চলতো, তাতে নানা বিষয়ের চর্চা হতো। পশ্চিমবঙ্গে যেহেতু (বামপন্থীদের কল্যাণে) রাজনীতির বাইরে কিছুই হয় না, তাই এর একটা বড়ো জায়গা জুড়ে থাকত রাজনৈতিক আলোচনা, তাতে আমি প্রায়ই যোগদান করতাম, সাধারণত বক্তা হিসেবে, কখনোসখনো শ্রোতা হিসেবে। তাতে শ্যামাপ্রসাদের প্রসঙ্গ প্রায়ই উঠত এবং শ্যামাপ্রসাদের পূর্ণাঙ্গ জীবনীকার হিসেবে আমাকে তাঁর সম্বন্ধে কিছু না কিছু বলতেই হতো। সবশেষে আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাবতাম, ভাগ্যিস শ্যামাপ্রসাদ জন্মেছিলেন, তাই তো আমরা এই হিন্দুপ্রধান পশ্চিমবঙ্গে বাঙ্গালি হিন্দু ও ভারতের নাগরিক হয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারছি, গোটা বঙ্গ পাকিস্তানে গেলে কী দুর্দশাই না হতো আমাদের।

আজকের এই ছোটো নিবন্ধটিতে আমার বক্তব্য হলো, সেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সময় অতীত। বস্তুত, আজকে আমরা বাঙ্গালি হিন্দুরা এক ভয়াবহ সন্ধিক্ষণে উপনীত যেখান থেকে আমাদের বাঁচবার সামান্য সম্ভাবনা রয়েছে, যদি আমরা আমাদের বিপদ সম্বন্ধে সজাগ হই এবং বাঁচবার জন্য যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করি। আর যদি তা না করি, যদি আমরা জাতীয়তাবাদী বাঙ্গালি হিন্দুরা ভাবি, আমাদের ভয় কীসের, কেন্দ্রীয় সরকার আছে, সেনাবাহিনী আছে, তাহলে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে সেই ভবিতব্য যার থেকে শ্যামাপ্রসাদ আমাদের ত্রাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, কিন্তু যে সর্বনাশ থেকে এরপর আমাদের কেউ বাঁচতে পারবে না। তার কারণ যে শুধু শ্যামাপ্রসাদ নেই, তাঁর সমতুল্য নেতা নেই, তা কিন্তু নয়। তার কারণ সামগ্রিক পরিস্থিতি হিন্দু বাঙ্গালির প্রতিকূলে ভয়ানকভাবে বদলে গেছে।

কেন এরকম বিকট ভবিষ্যদ্‌বাণী করছি, যাকে ইংরেজিতে বলে ‘প্রফেট অফ ডুম’-এর মতো? যে পরিস্থিতির কথা বলছিলাম তার

চেহারাটা একটু খতিয়ে দেখা যাক। যেহেতু ব্যাপারটা পুরোপুরি রাজনৈতিক, তাই এ নিয়ে যথাকর্তব্য করার ভার বর্তায় ভারতীয় জনতা পার্টির উপরে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহমর্মী বিবিধ সংগঠনের মধ্যে এর প্রাথমিক দায়িত্ব বিজেপির উপরেই, তবে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদেরও এতে কিছু ভূমিকা আছে। এই সামগ্রিক পরিস্থিতিটা নিয়েই এই নিবন্ধের আলোচনা।

প্রথম কথা বাংলাভাষীদের মধ্যে (আমি সারা পৃথিবীর, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ ও উত্তরপূর্ব ভারতের কথা বলছি), হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের অনুপাত হিন্দুর প্রতিকূলে বিপজ্জনকভাবে কমে গেছে। ১৯৪১ সালের লোকগণনা অনুযায়ী এই অনুপাত ছিল হিন্দু : মুসলমান ৪৫ : ৫৫। আজ সেটা এসে দাঁড়িয়েছে ৩০ : ৭০-এ। এর একমাত্র কারণ, হিন্দুদের জন্মনিয়ন্ত্রণ এবং মুসলমানদের অবারিত, ধর্ম দ্বারা প্রোৎসাহিত— প্রজনন। এবার বাংলাভাষী অধ্যুষিত দুটি প্রধান ভূখণ্ডের কথা ধরুন। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫১ সালের লোকগণনা অনুযায়ী অনুপাত ছিল হিন্দু : মুসলমান ৮০ : ২০। আজ সেটা এসে দাঁড়িয়েছে ৭০ : ৩০-এ। আর যে ভূখণ্ডের আজকে নাম বাংলাদেশ, সেখানে ১৯৪১ সালে এই অনুপাত ছিল হিন্দু : মুসলমান ৩০ : ৭০, আজ সেটা এসে দাঁড়িয়েছে ৮ : ৯২-এ।

কেউ যেন না ভাবেন, এতে এত শঙ্কিত হওয়ার কী আছে? ভারতে মুসলমান আক্রমণ তো আরম্ভ হয়েছিল আজ থেকে প্রায় এক হাজার বছর আগে, তা সত্ত্বেও তো ভারত এখনো হিন্দুপ্রধান দেশই আছে। বাস্তবে তা নয়। আগে জন্মনিয়ন্ত্রণ ছিল না, চিকিৎসাব্যবস্থার এত উন্নতি হয়নি, তাই প্রজননের দিক দিয়ে হিন্দু-মুসলমান সমান সমান ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে হিন্দু পিতা-মাতারা সন্তানকে ভালো করে মানুষ করবেন বলে এক, দুই বা খুব বেশি হলে তিনের বেশি সন্তানের জন্ম দেন না—'হাম দো, হামারা দো' নীতি মেনে চলেন। অপরপক্ষে মুসলমানদের নীতি হচ্ছে 'হাম পাঁচ হামারা পঁচিশ', এবং এই নীতির পিছনে তাদের মোল্লা- মৌলভিদের সমর্থন আছে। অতএব এইভাবে চললে বাঙ্গালি হিন্দুর কী হবে তা অনুমান করা শক্ত নয়।

এছাড়াও মনে রাখতে হবে, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ হওয়ার পরে তারা সেই ভূখণ্ড থেকে হিন্দু ও শিখদের তাড়িয়েছে কিন্তু আমরা মুসলমানদের এই দেশে সসম্মানে রেখে দিয়েছি। হাম পাঁচ হামারা পঁচিশ নীতি অনুসরণ করার ফলে সেদেশে, বিশেষ করে বাংলাদেশে, জনবিস্ফোরণ ঘটেছে এবং সেই অতিরিক্ত জনসংখ্যার ভার তারা অনুপ্রবেশের মাধ্যমে ভারতে চালান করে দিয়েছে। আর ভারতে ভোটলোভী 'সেকুলার' দলগুলো নির্লজ্জভাবে এদের সব রকম সুবিধা দিয়েছে। এর অবশ্যম্ভাবী ফল, জনগোষ্ঠী হিসেবে বাঙ্গালি হিন্দুর গুরুত্ব কমবে এবং কালক্রমে তারা সংখ্যালঘু হয়ে যাবে। তারপর? সুকুমার রায়ের ভাষায়, ''তারপর কি হইল জানে শ্যামলাল।''

যদি বাঙ্গালি হিন্দু বেঁচে থাকতে চায় তবে এর একটা সমাধান বের করতে হবে, করতেই হবে, এবং এই সমাধান বেরোবে রাজনৈতিক প্রক্রিয়াতেই, অন্য কোনো উপায়ে নয়। রাজনৈতিক প্রক্রিয়া কে করবে? কংগ্রেস ও কমিউনিস্টরা ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলটির সঙ্গে জাতীয় স্তরে হাত মিলিয়ে বসে রয়েছে। দিল্লিতে তাদের তৈরি এই গঠবন্ধন হলো— ইন্ডিজোট। তাই পশ্চিমবঙ্গের প্রধান ও একমাত্র বিরোধী দলকে বিজেপিকেই এই রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটাতে হবে, এই প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এখানেই আসছে প্রশ্ন যে এই প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র বিরোধী দলকে তা হলে কী করতে হবে?

প্রথমত, মজবুত সংগঠন যে কোনো রাজনৈতিক দলের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হয়ে উঠতে পারে। নবীনবরণের মাধ্যমে নতুন সদস্যদের দলের মূলস্রোতে শামিল করার পাশাপাশি বিভিন্ন সাংগঠনিক স্তরে প্রবীণদেরও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণের মাধ্যমে সাংগঠনিক ভিত্তি সার্বিকভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠবে। তার সঙ্গে উচিত রাষ্ট্রবাদী বিচারধারার উপলব্ধি এবং সার্থক প্রয়োগ। নবীন-প্রবীণের মেলবন্ধনে সংগঠনে ভারসাম্য রক্ষিত হবে, তারুণ্যের সঙ্গে অভিজ্ঞতার মিশেলে আগামীদিনের রাজনৈতিক

With Best Compliments from-

Laghu Udyog Bharati

All India Organisation in the Service of small scale industries

ADVOCATE ARVIND DHUMAL

All India Vice President
Co-ordinator Punjab, Chandigarh, J/K & Laddakh

লড়াইয়ের ক্ষেত্রে দল ও রাজ্যবাসী উপকৃত হবে। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকে দূরে সরিয়ে রাখতে না পারলে হিন্দু বাঙ্গালির স্বার্থরক্ষা তো দূরস্থান, সংগঠন রক্ষা করাও একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে। সংগঠনের মধ্যে ছন্নছাড়া পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে দল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এবং রাজনীতিতে কোনো শূন্যস্থান থাকে না, কেউ না কেউ এসে তার পূর্ণ করে দেয়। এক্ষেত্রে দিল্লিতে তৃণমূলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে থাকা সিপিএম সেই শূন্যস্থান পূরণ করলে তা হবে সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক। নবান্নে ফিশফ্রাই বৈঠকে হাজির বামপন্থীদের সঙ্গে এই রাজ্যে তৃণমূলের লড়াইটা পুরোটাই সাজানো। সাম্প্রতিক ভোটগুলিতে 'নো ভোট টু বিজেপি' প্রচার চালিয়ে, বিরোধী ভোট বিভাজনের মাধ্যমে রাজ্যের শাসক দলের সুবিধে করে দেওয়া ছাড়া রাজ্য-রাজ্যনীতিতে বামপন্থীদের কোনো ভূমিকা নেই। উনিশশো নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত কংগ্রেসের যে সিপিএমের পা-চাটা অবস্থা ছিল তাতে রাজ্যে সিপিএমের বিকল্প শক্তি কেউ ছিল না। মমতা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে সেই বিকল্প হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন। সেটা ছিল সংগ্রামী মমতা, এখন অত্যাচারী মমতার বিকল্প কে? বিকল্প অবশ্যই আছে, চোখের সামনেই আছে, কিন্তু সেটা কে সেটা বলা আমার কাজ নয়, দলের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্বই ঠিক করবেন। শুধু মনে রাখা, যে সময় বয়ে যাচ্ছে।

বিজেপির সাংগঠনিক সমস্যা বা একটা সুসংবদ্ধ রণনীতি, যাকে ইংরেজিতে বলে স্ট্র্যাটেজি, তার অভাব রয়েছে। এর ফলে শুধু জনসভা আর সাংগঠনিক সভা, মিটিং-মিছিল ইত্যাদি করা ছাড়া কী করতে হবে তা বিজেপির কেউ জানেন না। এই সব সভাও কোন ইস্যু নিয়ে হবে, তাতে দলের কার্যকর্তাদের ও সাধারণ মানুষকে কী বলা হবে, কোন কোন আন্দোলন নিতে হবে, এসবের জন্য ভাবনাচিন্তা কেউ করেন না, করার কোনো রীতিই বিজেপিতে বিশেষ নেই। এগুলোর জন্য দলের নীতি প্রণয়ন করার জন্য বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞদের একটা কমিটি দরকার, যার সদস্যরা সাংগঠনিক ব্যাপারে একদম ঢুকবেন না, এইগুলো নিয়েই মাথা ঘামাবেন। এরকম কমিটিকে বলা হয় পলিটিকাল অ্যাফেয়ার্স কমিটি। একটা উদাহরণ দিই। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের তরফ থেকে একটা প্রচার ছিল, বিজেপি একটা উত্তর ভারতীয় পার্টি, হিন্দি বলয়ের পার্টি, বাঙ্গালি-বিরোধী পার্টি। এটি অত্যন্ত মারাত্মক প্রচার, এবং এর ফলে তৃণমূল বেশ খানিকটা সাফল্য পেয়েছে। কিন্তু এর মোকাবিলা করার জন্য বিজেপি কোনো পরিকল্পনা তৈরি করেছিল কি? করেনি। প্রত্যেক বক্তা তাঁর ব্যক্তিগত উপলব্ধি অনুযায়ী এই বিষয়ে আলাদা আলাদা কথা বলেছেন। ফল যা হওয়ার তাই হয়েছে।

এই উপলব্ধির ব্যাপারে এবার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে আসি, যার নাম হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক। বিজেপির অনেক প্রবীণ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নেতাদেরও একটা ভাসা-ভাসা ধারণা আছে, মুসলমানদের বুঝিয়েসুঝিয়ে বিজেপির দিকে নিয়ে আসা যেতে পারে। একেবারেই অলীক কল্পনা, আকাশকুসুম বা পক্ষীরাজ ঘোড়ার মতো। কাজী মাসুম আখতার, আলী হোসেন, শফিকুল ইসলামের মত মুষ্টিমেয় কিছু স্বচ্ছ চিন্তার মুসলমানকে বাদ দিলে, সাধারণ মুসলমানরা চোখের সামনে দেখছে তৃণমূল তাদের সবরকম সুবিধে দিচ্ছে, তারা অপরাধ করলেও ধরছে না বা ধরলেও মামলা হালকা করে দিচ্ছে—এত সুবিধে সিপিএমও তাদের দেয়নি। আর বিজেপি এই সবের সমালোচনা করছে। কোন দুঃখে তারা বিজেপিকে ভোট দেবে?

তাই একমাত্র উপায়, হিন্দু ভোটকে সংহত করা, বাঙ্গালি হিন্দুর সামনে যে ভয়াবহ ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে সে সম্বন্ধে তাদের অবহিত করা। মুসলমান ভোট ভাগ করার চিন্তা করে কোনো লাভ নেই, কারণ সে গুড়েবালি। এতে খালি সময় ও পয়সা নষ্ট হবে। পয়সা নষ্ট হবে। এই চেষ্টা এই নির্বাচনেও হয়েছিল, যার নিট ফল শূন্য। মুসলমানদের রাজনৈতিক চেতনা হিন্দুদের চাইতে হাজার গুণ টনটনে, তারা উচ্ছ্বাসে ভেসে ভোট দেয় না। তারা বিজেপির কাছ থেকে সবরকম সুবিধা নেবে, তারপর ভোট তৃণমূলকেই দেবে।

প্রচার সম্বন্ধেও রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলের তরফে সদর্থক ভাবনাচিন্তা প্রয়োজন। ২০২৪ সালে যেখানে কলকাতা শহর মমতার ছবি ও হোর্ডিঙে ভরে গিয়েছিল, সেখানে বিজেপি বোধ হয় আশা করেছিল তাদের জনসভায় বক্তৃতা শুনেই লোকে তাদের ভোট দিয়ে দেবে। জনসভার বক্তব্য লোকে বাড়ি যেতে যেতে ভুলে যায়, হোর্ডিং সবসময় চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে। এই সব কথা বুঝতে হলে উপরোক্ত পলিটিকাল অ্যাফেয়ার্স কমিটি প্রয়োজন। দলের বর্তমান অবস্থায় সে আশা কি দুরাশা নয়?

এই লেখক ১৯৯০ সাল থেকে ২০১৫ পর্যন্ত দলের সদস্য ছিল। তারপর পাঁচবছর রাজ্যপাল। ২০২১-এ দল যে ভয়াবহ রসাতলে নেমেছিল, তা একেবারে সামনে থেকে দেখেছে। এখন বয়স হয়ে গেছে, সক্রিয় রাজনীতি সম্ভব নয়। কোনো ব্যক্তিকে আঘাত করা এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, কোনো স্বার্থসিদ্ধির ধান্দার জন্য এটি লেখা হয়নি। উদ্দেশ্য একমাত্র অভিজ্ঞতাপ্রসূত পরামর্শ দান। সেই পরামর্শ নিয়ে পাঠক কী করবেন, বিজেপি কী করবে, সেটা সম্পূর্ণ পাঠক বা বিজেপির ব্যাপার। তবে একটা কথা বলে রাখা ভালো, পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজনীতিতে সম্পৃক্ত রাজ্যে বর্তমান প্রধান বিরোধী দল যদি ডোবে, তবে কেউ রক্ষা পাবে না। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো সর্বনাশ হবে বাঙ্গালি হিন্দুর।

DUTA
SPICE POWDER & PAPAD
থাকে যদি
ডাটা
জমে যায় রান্নাটা
কেনার সময় অবশ্যই
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী)
প্রাইভেট লিমিটেড
নাম দেখে তবেই কিনবেন
DUTA CUMIN POWDER
DUTA TURMERIC POWDER
DUTA CORIANDER POWDER
DUTA RED CHILLI POWDER
Krishna Chandra Dutta (Cookme) Pvt. Ltd.
Regd. Office : 207, Maharshi Debendra Road, Kolkata - 700007
Contact : (M) 98366-72200 / (033) 2259-1796/5548
Email : dutaspice@gmail.com | Website : www.dutaspices.com

বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকী এবং চাকী পরিবার

সুব্রত চাকী

অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অবিভক্ত বঙ্গের অগ্নিযুগের প্রথম হুতাত্মা মহান বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর জন্ম হয় অধুনা বাংলাদেশের বগুড়া জেলার অর্ন্তগত, শিবগঞ্জ উপজেলার এক প্রত্যন্ত বিহার গ্রামের পোদ্দার পাড়ায়। দিনটা ছিল ১২৯৫ বঙ্গাব্দের ২৭ অগ্রাহায়ণ মঙ্গলবার, ইংরেজি ১৮৮৮ সালের ১০ ডিসেম্বর রাতে। তাঁর বাবার নাম রাজনারায়ণ চাকী, মা স্বর্ণময়ী দেবী।

বৃহৎ এই 'চাকী' বংশের আদি নিবাস ছিল বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত পাবনা জেলার চাঁচকিয়া গ্রাম। প্রফুল্ল চাকীর প্রপিতামহ মহেন্দ্র নারায়ণ চাকীর বাবা প্রাণকৃষ্ণ নারায়ণ চাকী চাঁচকিয়া গ্রামের আদি নিবাস ছেড়ে বগুড়া শহরের দক্ষিণে করতোয়া নদীর তীরবর্তী সাজাপুর গ্রামে বসবাস শুরু করেন। প্রাণকৃষ্ণ নারায়ণ চাকীর মৃত্যুর পর তার পুত্র মহেন্দ্র নারায়ণ চাকী সাজাপুর গ্রাম ছেড়ে এই গ্রামেরই উত্তরপূর্বে মাদলা গ্রামে বসবাস শুরু করেন। মহেন্দ্র নারায়ণের তিন ছেলে— ইন্দ্রনারায়ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ ও চন্দ্রনারায়ণ। চাকী বংশের মূল পদবি 'বসু'। সেই সময় চাঁচকিয়া গ্রামের অধিবাসীদের 'চাকী' উপাধি হয়। চন্দ্রনারায়ণ চাকী হলেন বঙ্গের প্রথম হুতাত্মা বিপ্লবী প্রফুল্ল চন্দ্র চাকীর ঠাকুরদাদা। চন্দ্রনারায়ণ চাকী মাদলা গ্রাম ছেড়ে নাগর নদীর তীরবর্তী বগুড়া জেলার অর্ন্তগত শিবগঞ্জ থানার অধীনে বিহার গ্রামের পোদ্দার পাড়ায় বসতি স্থাপন করেন। চন্দ্রনারায়ণ চাকী বগুড়া শহরে মোক্তারি করতেন। তাছাড়া সংস্কৃত ও উর্দু ভাষায় তাঁর বিশেষ জ্ঞান ছিল। জ্যোতিষ চর্চা করতেন এবং এই বিষয়ে বহু মানুষ তাঁর কাছে উপদেশ নিতে আসতেন। অত্যন্ত সজ্জন ও ধর্মানুরাগী চন্দ্রনারায়ণ পায়ে হেঁটে বহু তীর্থস্থান ভ্রমণ করেন। নিষ্ঠাবান হিন্দু হিসেবে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। চন্দ্রনারায়ণ চাকীর একমাত্র ছেলে রাজনারায়ণ চাকী হলেন প্রফুল্লর বাবা। অত্যন্ত ধর্মানুরাগী, সত্যানুরাগী ও সর্বধর্মনিষ্ঠ হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল। বগুড়ার নবাব এস্টেটের একজন উচ্চ পদস্থ কর্মচারী হিসেবে দীর্ঘ ৪৫ বছর অত্যন্ত সততার সঙ্গে চাকুরি করেন। গ্রামে জলকষ্ট দূর করার জন্য বেশ কয়েকটি পুকুর প্রতিষ্ঠা করেন। পৈতৃক পদাঙ্ক অনুসরণ করে বাড়িতে দোল, দুর্গাপূজা এবং হিন্দুধর্মের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান মহা সমারোহে পালন করা হতো । রাজনারায়ণ চাকীর বিয়ের কিছু সময়ের মধ্যে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়। স্ত্রীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে রাজি

ছিলেন না—কিন্তু আত্মীয়স্বজন বিশেষ করে কুলগুরু রাখালচন্দ্র গোস্বামীর অনুরোধে বা আদেশে বিয়ে করেন স্বর্ণময়ী দেবীকে। চাকী পরিবারে তখন অন্যান্য ধর্মানুষ্ঠান ছাড়াও সন্তানলাভের জন্য কার্তিকপূজা করা হতো। বিয়ের বেশ কিছু বছর পরে জন্ম হয় বড়ো ছেলে প্রতাপচন্দ্র চাকীর। দ্বিতীয় ছেলের নাম জগৎনারায়ণ চাকী, তৃতীয় কন্যাসন্তান কুসুম কামিনী দেবী। তারপরে চারুচন্দ্র চাকী। তারপর সেই দেবশিশু ভারতের গর্ব বীর বিপ্লবী প্রফুল্ল চন্দ্র এবং তার কিছু পরেই জন্ম হয় ছোটোমেয়ে ও প্রফুল্লর ছোটোবোন সৌদামিনী দেবী। প্রফুল্লের আদরের নাম ফুলো/ফুলু। গাল দুটো খুব ফোলা ফোলা ছিল বলে মা আদর করে এইনামে ডাকতেন। ফুলোর জন্মের পরেই সংসারে আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পায়। সেইজন্যে ফুলো খুবই আদরের সন্তান। কুসুমকামিনী দেবীর বিয়ে হয় বহুড়া শহরের অধিবাসী হেমচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে এবং ফুলোর ছোটদাদা চারুচন্দ্র চাকী তাঁদের বাড়িতে থেকেই পড়াশোনা করতেন। সৌদামিনীকে সকলে 'খুকি' বলে ডাকতেন এবং তাঁর জন্মের কিছুদিনের মধ্যেই হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে রাজনারায়ণ চাকীর মৃত্যু হয়। অকস্মাৎ আর্থিক সংকট দেখা দেয় বৃহৎ চাকী পরিবারে। ফুলোর বয়স তখন আড়াই/তিন বছর মাত্র। ফুলোর ছোটো বোন সৌদামিনীর বিয়ে হয় বগুড়া জেলারই দুপচাঁপিয়া থানার অন্তর্গত আটগ্রামের হরিগোপাল নন্দীর সঙ্গে। সৌদামিনীর মৃত্যু হয় ১৩১৫ সালের ২২ শ্রাবণ। ১২৯৮ সালে রাজনারায়ণ চাকীর হঠাৎ মৃত্যুর পর বৃহৎ চাকী পরিবারের দায়িত্ব পড়ল বড়ো ছেলে প্রতাপ চন্দ্র চাকীর উপর। তখন তিনি এফ.এ পড়ছেন রংপুর শহরে। পড়া ছেড়ে তিনি গ্রামে ফেরেন এবং বগুড়ার নবাব এস্টেটে সার্কেল অফিসারের চাকুরি নেন। সংসারে সেই সময় খুব অর্থকষ্ট কিন্তু তখন সেইসব বোঝার মতো বয়স ফুলোর হয়নি। সে কিন্তু স্বাভাবিকভাবে বড়ো হতে থাকে। উল্লেখ্য, প্রতাপ চাকী পরবর্তীকালে পাশের গ্রাম নামুজার জ্ঞানদা প্রসাদ মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক পদে চাকুরি পান এবং প্রফুল্ল চন্দ্র চাকী (ফুলো) এই স্কুল থেকেই মাইনর পরীক্ষায় পাশ করেন।

ফুলোর ছোটোবেলা সংক্রান্ত তথ্য যা আমাদের পরিবারের থেকে আমি পেয়েছি তার সবকিছুই জানা যায় আমার ঠাকুরদা বীরেন্দ্র নাথ চাকী এবং আমার বাবার জ্যাঠামশাই উপেন্দ্র নারায়ণ চাকীর কাছ থেকে। আমি আমার ঠাকুরদার কাছে কিছু কথা শুনেছি, যদিও তখন আমি বেশ ছোটো। আমার বাবার জ্যাঠামশাইকে আমি দেখেছি কিন্তু তাঁর কাছ থেকে গল্প শোনার বয়স আমার হয়নি। আমার বাবা শরদিন্দু চাকী আমাকে বেশ কিছু কথা বলেছিলেন এবং আরও বেশ কিছু কথা আমি জেনেছিলাম জগৎ নারায়ণ চাকীর নাতি বলাই চাকীর কাছে।

এক প্রত্যন্ত গ্রামের মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে হিসেবে ফুলো বেড়ে ওঠে। ছোটোবেলায় সে বেশ শীর্ণ ছিল কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শরীর চর্চা ও খেলাধুলার মাধ্যমে যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠে। অত্যন্ত মিষ্টভাষী ফুলোকে সবাই খুব পছন্দ করত। দারুণ স্মরণশক্তি এবং মেধাবী ছাত্র হিসেবে শিক্ষকরাও ফুলোকে পছন্দ করতেন। মিতভাষী, সংযমী, বিনয়ী ফুলো ছোটোবেলা থেকেই ছিলেন নির্ভীক এবং যে কোনো কাজ গভীর নিষ্ঠা ও মনোযোগ দিয়ে শেষ করতে চেষ্টা করতেন। প্রতাপ চাকী ফুলোর একটা ঠিকুজি তৈরি করান বগুড়া জেলার মালতীনগর নিবাসী জ্যোতির্বিদ যোগেশ চন্দ্র জ্যোতিষতীর্থের কাছ থেকে পাওয়া একটা ডিকশনারি আমার কাছে আছে। প্রফুল্ল চন্দ্র চাকীর হস্তাক্ষরযুক্ত ব্যবহৃত ডিকশনারি এবং সঙ্গে একটা ফুলোর জন্মভিটার ছবি যাতে শিশু ফুলোকে দেখা যাচ্ছে। সম্ভবত ১৮৯০ সালের তোলা ছবি। ডিকশনারিটি প্রফুল্ল রংপুর জেলা স্কুলের অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময়ে ১৯০৫ সালের।

ফুলোর এই ঠিকুজিটি নীচে দেওয়া হলো— যদিও এর কিছু অংশ আমার সম্পাদিত এবং কথোপকথন প্রোডাকসনস্ প্রকাশিত 'বিপ্লবী প্রফুল্লচন্দ্র চাকী' বইটি সংযোজিত আছে। কিন্তু এখানে পুরোটাই দেওয়া হলো ঃ-

শুভমস্তু শকন রপতরতীতা স্বাদায়ঃ

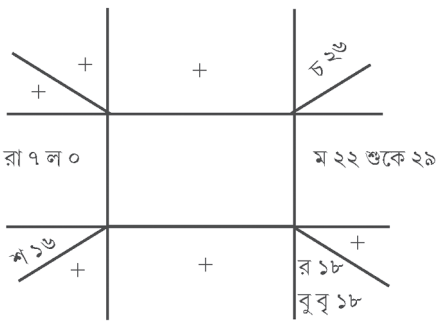

১৮১০/৭/২৬/৩৬/১০ বঙ্গাব্দ ঃ ১২৯৫/২৭ শে অগ্রাহায়ণ মঙ্গলবার রাত্রি দং ৯।৩৬ পল সময়ে বগুড়া অর্ন্তগত বিহার গ্রাম নিবাসী রাজনারায়ণ চাকী মহাশয়ের চতুর্থ পুত্র প্রথম হুতাত্মা প্রফুল্ল চন্দ্র চাকীর জন্মকুণ্ডলী সংক্ষিপ্ত বিচার।

বিংশোত্তরী শনি দশা ভোগ্য বর্ষাদি– ৭।৫।১২।১৭

পূর্বাহঃ	জাতহিঃ	পরাহঃ
২ ২৫ ১৫	৩ ২৬ ১৬	৪ ২৬ ১৭
৮ ৫৮ ১৩	৯ ৬০ ১০	১০ ০ ৮
৫৬ ৫ ৪১	৫৭ ০ ৪৪	৬০ ৩৮ ৪৭
২০ ০ ২৬	৪৬ ২ ২৭	০ ৪ ২৮

কর্কটলগ্নে মীন রাশিতে জন্ম। লগ্নে বলবান রাহু গ্রহের অবস্থান এবং লগ্নে পঞ্চমপতি দশমপতি কেন্দ্রস্থ তুঙ্গী মঙ্গল গ্রহের বুদ্ধি বা বিষয়াস্থানাধিপতি কেন্দ্রগত শুক্রগ্রহের ও মঞ্চমাহু ভাগ্যপতি বৃহস্পতি প্রবহর পূর্ণদৃষ্টি, লগ্নেশ চন্দ্রের ভাগ্যস্থানে অবস্থান, লগ্নস্থ রাহু ও ভাগ্যপতি বৃহস্পতি কর্তৃক পূর্ণদৃষ্ট ও রব্যাদি সমুদয় গ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হওয়ায়, পঞ্চমে রবি বুধ বৃহস্পতি ত্রিগ্রহ এবং সপ্তমে কেন্দ্র ত্রিযোগপতি মঙ্গলসহ কেন্দ্রপতি শুক্র যোগাদি হেতু জাতবর্ণ শ্যামবর্ণ দেহবিশিষ্ট মধ্যম স্বাস্থ্যবান, পিত্ত শ্লেষ্মা প্রকৃতি রজোগুণ বিশিষ্ট উন্নতমনা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন, মেধাবী, উৎসাহী, সাহিত্য-শিল্প, বিজ্ঞান,

বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা শাস্ত্রাদি অধ্যাত্মবিদ্যানুরাগী তেজস্বী, নির্ভীক, নেতৃত্বকুশল, যুদ্ধবিগ্রহ বা রাজনৈতিক বিপ্লবাত্মক কর্মকুশল, আত্মত্যাগী বীর প্রকৃতি। লগ্নপতি চন্দ্রের প্রতি লগ্নাহ রাহু পূর্ণদৃষ্টি এবং লগ্নাহ রাহুর প্রতি মারক স্থানগত কেতুযুক্ত মঙ্গল শুক্রের পূর্ণদৃষ্টি, মকরপতি সপ্তম অষ্টমপতি শনি প্রবল মরকস্থানে দ্বিজয়ে অগ্নিরাশি সিংহে অবস্থান করত মৃত্যুস্থানে পূর্ণদৃষ্টি করায় জাতকের অল্পায়ু যোগ ও আত্মহত্যা যোগ।

জাতকের বয়স ১৫ বৎসর ১১ মাস ১২ দিন গতে বুধের দশায় মঙ্গলের অন্তর্দ্দশায় পাঠ্য জীবন শিক্ষা বিভ্রাট এবং এই সময় হইতে গুরুজনের অবাধ্যতা, ব্যুৎপত্তি কামনা সঞ্জীবিত হইতে থাকে।

১৬ বৎসর ১১ মাস ৯ দিন গতে ব্যয়পতি ও তৃতীয়পতি মারক বুধের দশায় লগ্নস্থ বলবান রাহু গ্রহের অন্তর্দ্দশায় জাতকের রাজনৈতিক বিপ্লবাত্মক দল গঠন এবং ১৯ বৎসর ৪ মাস পর্য্যন্ত দুঃসাহসিকতায় নানা স্থানে ভ্রমণ বিপ্লবাত্মক কর্ম্মানুষ্ঠান। তৎপর ১৯ বছসর ৪ মাস গতে ১৯ বৎসর ৫ মাস ২৭ দিন মধ্যে বুধের দশায় রাহুর অন্তর্দ্দশায় মঙ্গলের প্রত্যন্তর্দ্দশায় (রাহুকেতু মঙ্গল) ত্রিরূপে বর্ষে বিংশবর্ষে বিপ্লবাত্মক কর্ম্মে আত্মদান বা অকালমৃত্যু।

ফুলোর ঠিকুজি বিচার হলো। এরপর ফুলো বাল্যকাল সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় প্রতাপ চাকীর বড়ো ছেলে উপেন্দ্র নারায়ণ চাকীর লেখা থেকে। সেই লেখাটা আমি নীচে বর্ণনা করলাম—

''আমার দেড় বছর বয়সে আমার মা কুমুদিনী দেবীর মৃত্যু হয়। তখন থেকে আমি আমার ঠাকুমা অর্থাৎ স্বর্ণময়ী দেবীর কাছে বড় হই। প্রফুল্লচাকী বা ফুলো ছিলেন আমার ছোটকাকা। আমার ছোটপিসির নাম সৌদামিনী বা খুকি। আমার খাওয়া ও স্নান করানোর দায়িত্ব ছিল ছোটপিসির উপর এবং পড়া, খেলাধুলা, বেড়ানোর দায়িত্ব ছিল ছোটকাকার। রাতে শুতাম ঠাকুমার কাছে। ছোটকাকাকে দেখেছি তিনি খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃকৃত্য শেষ করে কিছুক্ষণ ডন-বৈঠক করতেন। তারপর ভেজানো ছোলা, আখের গুড় ও একগ্লাস জল খেয়ে প্রায় একঘণ্টা মতো সারাগ্রাম ঘুরে আসতেন। তারপর আমরা একসঙ্গে পড়তে বসতাম—সেই নামুজার স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন আমার বাবা প্রতাপচন্দ্র চাকী। সকাল ৯টা সাড়ে ৯টা পর্যন্ত পড়াশোনা করে স্নানের আগে আধঘণ্টা মতো খেলাধুলা করতাম, ছোটকাকা মাঝে মাঝে নিজেদের জমি থেকে সবজি তুলে আনতেন। স্নান করে ছোটকাকা নামুজার স্কুলে এবং আমি গ্রামেরই এক পাঠশালায় পড়তে যেতাম। বিকেলে আমার ছোটকাকা স্কুল থেকে ফিরতেন, আমিও পাঠশালা থেকে ফিরতাম এবং একসঙ্গে আমার ঠাকুমার হবিষ্যান্নের প্রসাদ খেয়ে কবাডি, হা-ডু-ডু, ডাংগুলি প্রভৃতি খেলাধুলা করতাম সন্ধ্যা পর্যন্ত। কোনো সাংসারিক কাজকর্ম থাকলে তাও আমরা এই সময়েই করতাম। এইভাবেই আমার ছোটকাকাকে বাল্যকাল কাটাতে দেখেছি। ছোটকাকার শরীর ক্ষীণ হলেও খুব শক্তি ছিল। প্রখর স্মরণশক্তি, উজ্জ্বল দৃষ্টিশক্তি ছিল ছোটকাকার। নামুজা স্কুলে ফুটবল খেলা অথবা গ্রামের যে কোনো খেলায় যে দলে আমার ছোটকাকা থাকতেন সেই দলেরই জয় হতো। প্রায় ৩/৪ বছর পাঠশালায় পড়ার পর আমি ও ছোটকাকার নামুজা জ্ঞানদা প্রসাদ মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম। আমার মনে হয় প্রায় দুই বছর আমি ছোটকাকার সঙ্গে তাঁর নামুজা স্কুলে যাওয়ার সাথী হয়েছিলাম। তিনি স্কুলে যাওয়ার সময় আমার সঙ্গে স্কুলের পাঠ্য বিষয়ে আলোচনা করতেন। ছুটির পর আমারা ১৫/২০ জন একসঙ্গে আমাদের বিহার গ্রামে ফিরতাম।''

ফুলোর বাল্যজীবনের বা বিহারগ্রামে থাকার সময় এইভাবেই চলছিল। আগেই বলা হয়েছে পড়াশোনায় যথেষ্ট মেধাবী ছিলেন ফুলো। মাইনর পরীক্ষায় খুব ভালোভাবে পাশ করার পর বড় দাদা প্রতাপ চাকী ঠিক করলেন ভাইকে উচ্চশিক্ষার জন্য বগুড়া শহরে কুসুমকামিনী দেবীর শ্বশুরবাড়ি পাঠাবেন কিন্তু সেখানে তখন সেজভাই চারুচন্দ্র থাকেন এবং পড়াশোনা করেন। সেইজন্য প্রতাপ চাকী তাঁর ছোটভাইকে পাঠালেন রংপুর শহরে। প্রতাপ চাকীর শ্বশুর দুর্গাদাস নাগ ছিলেন রংপুর কোর্টের একজন ডাকসাইটে উকিল এবং খুবই পরপোকারী মানুষ হিসেবে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। বহু ছাত্র তাঁর বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করতেন। ফুলো চলে এলেন রংপুর শহরে এবং ভর্তি হলেন রংপুর জেলা স্কুলে। শেষ হলো ফুলোর বাল্যজীবন—শুরু হলো ভারতের গর্ব, বাঙ্গলার প্রথম হুতাত্মা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র দীনেশ রায় বা প্রফুল্ল চাকীর স্বাধীনতা সংগ্রাম।

এইবার আসা যাক 'চাকী পরিবার'-এর কথায়। প্রফুল্লকে সঙ্গে নিয়ে অন্নদাপ্রসাদ নাগ (প্রতাপ চাকীর মেজ শ্যালক) একটি কুস্তির আখড়া তৈরি করেন। যে কোনো ছুটিতে প্রফুল্ল বাড়ি আসতেন মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। গ্রামে একবার কুস্তি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়, সেই প্রতিযোগিতায় প্রফুল্ল বিজয়ী হন। প্রফুল্ল ও অন্নদা প্রসাদ দুজনেই লাঠিখেলা শেখা শুরু করেন। এই ব্যাপারে তাঁদের গুরু ছিলেন তৎকালীন নবাব বাড়ির প্রধান লাঠিয়াল ভাদু।

মাত্র দু'মাসের মধ্যে প্রফুল্ল লাঠি চালনার সমস্ত কৌশল, প্যাঁচ ইত্যাদি আয়ত্ত করেন। দু'হাতে দু'খানা লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে দশ মাইল রাস্তা যাতায়াত করতে পারতেন। বাড়ির পাশেই নাগর নদী, সুতরাং সাঁতার ছিল তার এক প্রিয় খেলা—অনবদ্য ছিল তাঁর ডুব সাঁতার। মা স্বর্ণময়ী দেবীর কথায় জানা যায় যে শেষবার যখন প্রফুল্ল বাড়ি এসেছিলেন তখন কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। শেষ বিদায়ের সময় প্রফুল্ল মা'কে প্রণাম করে বিদায় চাইলেন— চোখের জলে স্বর্ণময়ী দেবী বাঁ-হাতের কড়ে আঙুল কামড়ে বাঁ-পায়ের পদধূলি প্রফুল্লর ডান কানে ছোঁয়ালেন এবং বললেন, তুই চলে যাচ্ছিস, আমার কে থাকল। ফুলু উত্তর দিলেন—তিন দাদা থাকল ও উপেন থাকল। সেই বছরই প্রতাপ চাকী ভাইদের সম্পত্তি ভাগ করে দিলেন। ফুলো বললেন যে, আমার ভাগ মা পাবেন এবং মায়ের অবর্তমানে তিনদাদা সমানভাবে ভাগ করে নেবেন। সৌদামিনী বলেছিলেন ছোট্‌দা তুই বিয়ে করবি না? প্রফুল্ল নিজের বুকে একটা ক্ষতচিহ্ন দেখিয়ে বলেছিলেন, এই দাগ যতদিন থাকবে ততদিন বিয়ে করা, সংসার করা নিষেধ—গুপ্ত বিপ্লবীদলে যোগদানের সময় নিজের বুকের রক্ত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছিল। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে বা মার্চ মাসে

ফুলো শেষবার বাড়ি ছেড়ে যান এবং ২ মে ১৯০৮ সালে তাঁর জীবনাবসান ঘটে। প্রথম খবর পান ফুলোর সেজ্‌দা চারুচন্দ্র চাকী। তিনি বগুড়া জেলার অন্তর্গত সুখান পুকুরের কাছে বয়ডা মধ্য ইংরেজি স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। শিবগঞ্জ থানার একজন পুলিশ রসিক রায় সন্ধ্যায় চাকী পরিবারে খবর দেন। প্রফুল্লর লেখা সমস্ত চিঠিপত্র, কাগজ ইত্যাদি রাতারাতি পুড়িয়ে ফেলা হয়। এরপরে পরিবারকে বহু পুলিশি নিগ্রহের মধ্যে পড়তে হয়। কোথাও কোনো ঘটনা ঘটলে পুলিশ এসে চাকী পরিবারে তল্লাশি করত। আমাদের পরিবার বিভিন্নভাবে হেনস্থার শিকার হয়। সেই সময় কেউ স্কুল কলেজে পড়তে পর্যন্ত পারেননি। উপেন্দ্র নারায়ণ চাকী কাশী গিয়েছিলেন সংস্কৃত শিক্ষার জন্য, কিন্তু পুলিশি নিগ্রহের কারণে সেখানকার শিক্ষকদের কথায় ফিরে আসতে বাধ্য হন। বীরেন্দ্রনাথ চাকী (আমার ঠাকুরদা) ম্যাট্রিক পাশের পর কুচবিহার চলে যান কলেজে পড়াশোনার জন্য কিন্তু তাঁকেও পুলিশি হেনস্থার শিকার হতে হয় এবং কলেজ ছাড়তে বাধ্য করা হয়। আমাদের পরিবারে তখন 'যুগান্তর' সহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকা নিয়মিত আসত কিন্তু প্রফুল্লর মৃত্যুর পর সমস্ত সরিয়ে ফেলা হয়। তাই সার্চ করার পর পুলিশ বাড়িতে কিছুই পায়নি। প্রতাপ চাকী, চারুচন্দ্র চাকী এবং গ্রামের আরো দু'জন—ভারতচন্দ্র পোদ্দার ও মরহুম আলি কলকাতায় আসতেন আলিপুর বোমার মামলা চলাকালীন সাক্ষী দেওয়ার জন্য। যুগান্তর বিপ্লবী দলের বেশকিছু সদস্যের ছবি চারুচন্দ্র চাকীর কাছে ছিল। কিন্তু পুলিশি নিগ্রহের কারণে সেইসব ছবি নষ্ট করে ফেলা হয়। প্রতাপ চাকীর বগুড়া শহরে একটা বাড়ি ছিল এবং প্রফুল্ল শেষবারের মতো গ্রামের বাড়ি থেকে চলে আসার পরে তিনি (প্রতাপ চাকী) শহরের বাড়িতে চলে আসেন কিন্তু মাঝে মাঝে গ্রামের বাড়িতে যেতেন। বিহার গ্রামের আদরের ফুলো পরবর্তীকালে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী দীনেশ রায় বা প্রফুল্ল চাকীর পবিত্র পার্থিব শরীর আর কখনো বিহারে ফিরে আসেনি— প্রকৃতপক্ষে তাঁর দেহের কোনো হদিশ পাওয়া যায়নি। শুধুমাত্র প্রফুল্ল নয়, প্রতাপ চাকীর এক ছেলে হীরেন্দ্র নাথ চাকী বিদেশি দ্রব্য বর্জন আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহন করেন এবং সেইসময় বগুড়ার দ্রব্য বর্জন আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং সেইসময় বগুড়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট চুনীলাল মুখার্জীর কোর্টে চারআনা জরিমানা হয়। স্বাধীনতার পরে অর্থাৎ দেশভাগের পরে হীরেন্দ্র নারায়ণ চাকী সান্তাহারে আততায়ীর ছুরিকাঘাতে নিহত হন। প্রতাপ চাকী আর একছেলে পুলিন চন্দ্র চাকী দু'তিন বছর অন্তরীণ ছিলেন—এই সময়ে একটা সরকারী রিপোর্টে কী লেখা আছে তা নীচে তুলে দিলাম—

Ammendment Act, 6th August 1935

Chaki Pulin Chandra (Jugantar) son of Pratap Chandra of Shibbati, Bogra Town, Bogra (Born 1909) File No. 1446(X)34.

Orders --- Served direct with home domicile orders and domicile at Shibbati, Bogra on 12th March 1935, Village domicile at Khudirjangal, Karimganj, Mymensingh, on 2nd June, 1936. Released under section 2(1)(a) on 9th December, 1937. Released unconditionally on 8th June, 1938.''

প্রফুল্লর মৃত্যুর একমাস পরে হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে কুশপুত্তলিকা দাহ করে বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করেন বড়দাদা প্রতাপ চাকী। মায়ের ইচ্ছানুসারে তাঁহার আত্মার শান্তির জন্য প্রতাপ চাকী ত্রিগয়া করেন অর্থাৎ গয়া, পুরীর চক্রতীর্থ ও চন্দ্রনাথে পিণ্ড দান করা হয়। কোনো একসময় গ্রামের বাড়িতে যখন ফুলো ছিলেন তখন কেউ একজন তাঁর কাছে রিভালবার বা পিস্তল দেখে ফেলেন এবং স্বর্ণময়ী দেবীকে সেই কথা বলেন। মা ফুলোকে বললেন যে তুই কীসব করছিস্—আমাদের বংশের মুখ ডোবাবি—ফুলো মা'র কাছে প্রতিজ্ঞা করেন এবং বলেন যে মা, তোমার এই ফুলো এমন কিছু করবে না যাতে বংশের সম্মান নষ্ট হয়। সত্যিই তো ফুলো সেই প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন এবং স্বাধীনতার ৭৫/৭৬ বছর পরেও বিহার গ্রামে সেই ছোট্ট ফুলো ওরফে প্রফুল্ল চাকীর জন্য শুধু চাকী পরিবার সমস্ত দেশবাসী গর্বিত।

এই লেখা শেষ করার আগে একটা বিষয়ের উল্লেখ করা দরকার। হেমন্ত চাকী এই মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের একটা জীবনী লিখেছিলেন (সেই বই এখন ভারত সরকারের ডিজিটাল লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে) এবং সেই বইটির ভূমিকা লিখেছিলেন এক মহীয়সী নারী—শ্রীমতী বাসন্তী দেবী। হেমন্ত চাকীকে প্রফুল্ল চাকীর উত্তরসূরী হিসেবে বলা হয়েছে, কিন্তু আমি আমাদের বংশতালিকাতে এই নামটি কোথাও পাইনি। আমার সম্পাদিত 'বিপ্লবী প্রফুল্লচন্দ্র চাকী' শীর্ষক বইতে আমি একটা বংশতালিকা সংযোজিত করেছি। তবে প্রফুল্ল চাকীর ঠাকুরদা চন্দ্র নারায়ণ চাকীর আরও দুই দাদা ছিলেন— ইন্দ্রনারায়ণ এবং লক্ষ্মীনারায়ণ, তাঁদের কোনো বংশতালিকা আমার জানা নেই এবং সেই সূত্রে হেমন্ত চাকী প্রফুল্ল চাকীর উত্তরসূরী হতে পারেন।

আমার বাবা স্বর্গীয় শরদিন্দু চাকী (বিভু) বীরেন্দ্র নাথ চাকীর বড় ছেলে।

সূত্র ঃ পারিবারিক

মৃত্যুঞ্জয় প্রফুল্ল চাকী—সুধীর কুমার মিত্র

প্রফুল্ল চাকী—জলধর মল্লিক

সংযোজন ঃ 'বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট'-এর পক্ষে আমি দাবী জানাচ্ছি যে,

১। অবিলম্বে মোকামা জংশন-এর নাম পরিবর্তন করে এই মহান বিপ্লবীর নামে নামাঙ্কিত হোক।

২। পাঠ্যপুস্তকে এই মহান বিপ্লবীর নাম উপযুক্ত মর্যদার সাথে অর্ন্তভুক্ত করা হোক।

৩। অগ্নিযুগের ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্য একটা গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান অবিলম্বে প্রযোজনা এবং সেই প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হোক 'বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকী শহিদ ভবন।'

বাঙ্গালির সেরা ঠিকানা তার রান্নাঘর

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

প্রথমেই বলি সামলে খাবেন। অনেক খেতে হবে, অনেক দিন ধরে খেতে হবে। অনেক জিভে জল আনা সব খাবারদাবার সারি বেঁধে আসবে এখানে। তা বলে প্রাণপণে খাইখাই করলে হবে না কিন্তু। বাঙ্গালির রান্নাবান্না সমুদ্রের চেয়েও গভীর অতল, এ পথ শেষ হওয়ার নয়। রান্নার ঘ্রাণ পায় সারা পৃথিবী। এত পদ, এত ঝাল, ঝোল, অম্বল—যতই চেটেপুটে খাই না কেন প্রতি পাতে লেগে থাকে ইতিহাস। রসনা তৈরির বিবর্তনের গল্প। একটু এদিক থেকে ওদিক হলেই যেমন ছানার তরকারি পুড়ে যায়, ঠিক তেমনই নামের একটু এদিক থেকে ওদিক মানেই পদের বাহার বদলে যায়। পূজার হাওয়া চলছে। তবে বলুনতো ছ্যাঁচড়া আর লাবড়ার কী তফাত? ডাটা চিবাতে চিবাতে ভাবলেই হবে। বলি তবে। লাবড়া আসলে নিরামিষ পদ। খিচুরির সঙ্গে নানান আনাজ যোগে ম-ম, ঠাকুর ঠাকুর গন্ধের যে তরকারি চাই হলো লাবড়া। অষ্টমীর ভোগে যেটা চেটেপুটে খাব—ওটা কিন্তু লাবড়া। তবে ছ্যাঁচড়া? ওটা আমিষ পদ। মাছের তেল পটকা মাথা মুড়ো লেজা সব দিয়ে যে পাঁচমিশেলি সবজি ঘ্যাঁট তাহাই হলো ছ্যাঁচড়া। পরলৌকিক ক্রিয়া, অন্নপ্রাশনে এই পদটি থাকে। তাহলে! বাঙ্গালির হেঁসেল মানে এক আস্ত ধাঁধা। এক আস্ত রহস্যে ডুব দেওয়া। সেই ডুবে ডুবেই নানান পদ খেয়ে আসছি আমরা।

তবে বাঙ্গালির প্রথম লিখিত রান্নাবান্নার দলিল পাওয়া যায় ১৯৩১-এর বড়ু বগুড়া জেলার মহাস্থানগড় গ্রামের এক আবিষ্কৃত শিলালিপিতে। সেখানে বলছে সংবঙ্গীয়দের গ্রামে দুর্ভিক্ষের জন্য রাজার আদেশ এসেছে মহামাত্যের মাধ্যমে পুণ্ড্রনগরের রাজপুরুষের কাছে, দুর্ভিক্ষপীড়িতদের আপাতকালীন সাহায্য পৌঁছানোর। মৌর্যযুগের খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের ব্রাহ্মীলিপিতে লেখা—তিল সর্ষে ধান জোগানের কথা। তাই ভাত যে আমাদের সিগনেচারি খাওয়ার তা আর প্রমাণ করতে কসরত দরকার নেই। সরষের তেল আমাদের হেঁসেলের ঝাঁঝালো অহংকার। কেন হবে না? মঙ্গলকাব্য থেকে দ্বিজ বংশীদাস (ষোড়শ শতাব্দী)-এর মনসামঙ্গল কাব্যে ঝাঁঝে ভরপুরিয়ে লেখা—

''নিরামিষ রান্ধে সব ঘৃতে সম্ভারিয়া।
মৎস্যের ব্যঞ্জন রান্ধে তৈল-পাক দিয়া।''

বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল (পঞ্চদশ শতক) এও বলছে—

''সাজ কটু তৈল রান্ধে খরসুল মাছ।''

সরষের তেলই এখানে কটু তেল। তবে একটা সময় তিলের ব্যাপক ব্যবহার ছিল বাঙ্গালির সংস্কৃতিতে। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায় রসনায় তিলের ব্যবহার কমে তা আচার লৌকিক ব্যবহারে অধিক সীমাবদ্ধ হয়। তবে, নীহাররঞ্জন রায় বাঙালীর ইতিহাস-এ লিখছেন, ''মধ্যযুগীয় সুবিস্তৃত বাঙলা সাহিত্যে বাঙালীর আহার্য ও পানীয় সম্বন্ধে যে বিস্তৃত বিবরণ জানা যায় এবং তাহার মধ্যে রুচি ও রসনার যে সূক্ষ্ম বোধ সুস্পষ্ট, রন্ধনকলার যে সূক্ষ্ম ও জটিল পরিচয় বিদ্যমান, আদি পর্বের সংক্ষিপ্ত উপাদানের মধ্যে কোথাও সে পরিচয় ধরা

পড়ে নাই।" এই সূক্ষ্মতার এক গরমাগরম উদাহরণ প্রাকৃত পৈঙ্গল গ্রন্থে আছে (চতুর্দশ শতকের শেষ)—

''ওগ্‌গরা ভত্তা রম্ভঅ পত্তা গাইক ঘিত্তা দুগ্ধ সজুক্তা
মৌইলি মচ্ছা নলিতা গচ্ছা দিজ্জই কান্তা খা(ই)
পুনবন্তা।"

অর্থাৎ কলাপাতায় গরম ভাত, ঘি, মৌরলা মাছ এবং নালিতা অর্থাৎ পাটশাক যে স্ত্রী নিত্য পরিবেশন করে স্বামীকে খাওয়ায়, সেই স্বামী ভাগ্যবান।

কিন্তু ডাল নেই কেন? হবে কী করে। ডালের প্রথম উল্লেখ আসে মঙ্গলকাব্যে। বাঙ্গালির পাত পেড়ে কবজি ডুবিয়ে খাওয়ার বিবরণ আসে মঙ্গলকাব্যেই। রান্না যে আর্ট, বাঙ্গালির হেঁসেল যে জবরদস্ত মারপ্যাঁচ, তা হাড়েহাড়ে টের পাওয়া যায় মঙ্গলকাব্যেই। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ডাল হয়ে উঠল জনপ্রিয়। দরিদ্র কালকেতু জাউ আর ডাল খাচ্ছে। উল্লেখ রয়েছে ফুটকলাই, মুসুর, মাস, মুগ, ছোলার ডালের। এখান থেকেই জানতে পারি তখন বাঙ্গালির পাতে ছিল লাউ, বেগুন, কুমড়ো, ঝিঙে, কচু। নীহার রঞ্জনের মতে এই সব তরকারি ''আদি অস্ট্রেলীয় অস্ট্রিক ভাষাভাষীর দান।" তিনি বলছেন, ''পরবর্তীকালে বিশেষ করে মধ্যযুগে, পর্তুগিজদের চেষ্টায় এবং অন্যান্য নানাসূত্রে নানা তরকারি, যেমন আলু আমাদের খাদ্যের মধ্যে আসিয়া ঢুকিয়া পড়িয়াছে।" শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা রাঁধছেন নিমঝোল, শাক, পটোলভাজা, অম্বল। এখন কথা উঠতে পারে, তখন রন্ধনপ্রণালী কেমন করে মানুষ মনে রাখতেন? তখনতো আর রান্নার টেলিভিশন শো ছিল না বা রান্নার বই ম্যাগাজিনেরও প্রশ্ন নেই। তবে? চেটেপুটে খেতে তো হবেই। তাই বচনে বচনে রান্নার প্রণালী মানুষ মনে রাখত। যেমন ডাকের বচন উল্লেখ করছে—

''নিমপাতা কাসন্দির ঝোল। তেলের উপর দিয়া তোল।।
পলতা শাক রুহি মাছ। বলে ডাক ব্যঞ্জন সাঁচ।।
মদগুর মৎস্য দায়ে কাটিয়া। হিং আদা লবণ দিয়া।।
তেল হলদি তাহাতে দিব। বলে ডাক ব্যঞ্জন খাব।।
পোনামাছ জামিরের রসে। কাসন্দি দিয়া যেজন পরসে।।
তাহা খাইলে অরুচ্য পালাএ। আছক মানবের কথা দেবের লোভ যাএ।।
ইচিলা মাছ তৈলে ভাজিয়া। পাতি লেবু তাহাতে দিয়া।।
যাহাতে দেই তাহাতে মেলে। হিং মরিচ দেই ঝোলে।।
চালু দিহ যত তত। পানি দিহ তিন তত।।
ভাত উৎলাইলে দিহ কাটী। তবে জ্বালে ভাটি।।
বড় ইচিলা দায়ে কুটি। হিং দিয়া তৈল ভাজি।
উলটি পালটি দেহ পিঠ। ইহা কাইলে যোজন দিঠ্।।
পোড়া মাছ লবণ প্রচুর। আর ব্যঞ্জন পেলাহ দূর।
পাকা তেতলি বৃদ্ধ বোয়াল। অধিক করিয়া দিহ জ্বাল।।
কাটি দিয়া করিহ ঝোল। খাবার বেলা মাথা নাহি তোল।।"

এ যেন এক জীবন্ত রাঁধাবাড়ার কথা। এতো সব বেশ কঠিন রান্নাকথা। আর পান্তাভাত। তার কথা বলব না বুঝি। দীনেন্দ্র রায় রচিত পল্লী বৈচিত্র্য (১৯০৫)-তে বাঙ্গালির লোকাচার ও রন্ধন কথার উল্লেখ করেছেন। শীতলা ষষ্ঠী অর্থাৎ শ্রীপঞ্চমীর পর দিন অরন্ধন, বাঙ্গালির খাওয়ার উল্লেখ করেছেন—

''রৌদ্রে পিঠ দিয়া বসিয়া অরন্ধনের পান্তাভাত খাইতে আরম্ভ করিল। আজ পান্তাভাতের উপকরণও অদ্ভুত— পান্তাভাতের সঙ্গে তৈল, লবণ, ও কাঁচালঙ্কা বিরাজিত ও আস্ত কলাইসিদ্ধ, লম্বা লম্বা আলতাপাতি শিমসিদ্ধ, সলে বেগুনসিদ্ধ, বেথোর পাতা ও কুল সিদ্ধ...।"

মনসামঙ্গলেও পান্তাভাত আর গোটা সিদ্ধ খাওয়ার উল্লেখ রয়েছে। বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলে ইলিশ মাছের সঙ্গে পান্তাভাতের হাত ধরাধরি যেন খেটে খাওয়া বাঙ্গালির খাদ্য প্রতীক হয়ে উঠেছে। হিন্দু বাঙ্গালির রান্নাঘর দখল করা এত সহজ নয়। ১২০৪–০৫ খিলজি হানাদার বকতিয়ার খিলজি লক্ষ্মণসেনের অন্যতম রাজধানী নবদ্বীপ দখল করে। তখন মধ্যাহ্নভোজ সারছিলেন লক্ষ্মণ সেন। তারপর মুসলমান আক্রমণ হয়েছে শত শত বছর ধরে। কিন্তু হিন্দু বাঙ্গালির হেঁসেল ঠিক থেকেছে। যেমন পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ফরাসি, ইংরেজ এসেছে। কিছু মিশেছে আমাদের সঙ্গে। তা চিরকালীন সাংস্কৃতিক নদী প্রভাবের প্রাকৃতিক অংশ। একইভাবে আমাদের রন্ধনপ্রণালীতেও এটা,ওটা,সেটা মিশেছে। কিন্তু শিল-নোড়ার দখল আমাদেরই থেকেছে।

তারপর, আর এক চেটেপুটের গল্প ছিল চাঁদ সদাগরের বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠানে। বেহুলা এল পুত্রবধূ হয়ে। সেদিন কাঠের আগুন আর হাঁড়িতে রান্না হলো ১৮ রকম মাছের পদ। বাঙ্গালি যে মাছে- ভাতে তা চাঁদ সদাগর প্রথম দেখাল। বেসন দিয়ে চিতলমাছের কোলভাজা, মাগুরমাছ দিয়ে মরিচের ঝোল, বড়ো বড়ো কই মাছে কাটার দাগে জিরা লবঙ্গ মেখে তেলে ভাজা, মহাশোলের অম্বল, ইচা (চিংড়ি)-র রসলাস, রোহিত (রুহি) মাছের মাথা দিয়ে মাসকলাইয়ের ডাল, আম দিয়ে কাতলা মাছ, পাবদা মাছ, আদা দিয়ে শুক্তনি, আমচুর দিয়ে শোলমাছের পোনা, তেঁতুল মরিচ-সহ বোয়াল মাঝের ঝাঁটি, ইলিশমাছ ভাজা, বাচা, ইচা, শোল, শোলপোনা, ভাঙ্গনা, রিঠা ও পুঠা (পুঁটি) মাছভাজা। এ যেন এক বাঙ্গালির রান্নার ব-দ্বীপ। তা ছাড়াও ছিল পাঁঠা, হরিণ, মেষ, কবুতর, কাউঠা (ছোট কচ্ছপ) মাংস। যদিও আজকের বাঙ্গালির পাতে পাঁঠার মাংস (খাসি) ব্যতীত আর কিছুই নেই। তা অবশ্যই

পরিবর্তিত প্রাণী সংরক্ষণ নিয়মের কারণেও। বরং যুক্ত হয়েছে মুরগি। যা হিন্দু বাঙ্গালির রসনায় অবিচ্ছেদ্য হয়েছে। এও এক রূপান্তরিত স্বাদ বই কী।

১২০০–১৮৫৮ এই সময়কাল ছিল ভারতের বস্ত্র আমদানির সময়। সেই তালেই টুকটুক করে খাবারেও মিশেছে নানান দেশের স্বাদ। খাবারের স্বাদ বদলের গবেষণা নিঃশব্দে চলে। ভাষা যেমন পরিবর্তনশীল, খাদ্য ভোজ রসনাও তেমনই। ১৬১০-এ ঢাকা যখন সুবা বাঙ্গলার রাজধানী হলো তখন মুঘলরা বাঙ্গালির এপাশে ওপাশে ঘুরছে। বাঙ্গালি ভাতের বদলে কোফতা খেল। মাংসে ডুমো করে আলু মেশাল। আম আর বেলপানার বদলে কখনও কখনও গোলাপজল দেওয়া সরবত পান করল। বাঙ্গালি খেল মোগলাই। খেল পর্তুগিজদের আনা আনারসের চাটনি। তৈরি হলো অদ্ভুত সব রান্না— শিউলি পাতার কাটলেট, পলতার বড়া, নিমঝোল, চালকুমড়োর শুক্তো, এঁচোরের গুলিকাবাব। তবে এই রান্নাগুলি জনপ্রিয় হলো মূলত দেশভাগের কালে। তখন অনেক অনটন। তাই অপচয় ছাড়া হেঁসেল হয়েছিল বাঙ্গালির বড়ো চ্যালেঞ্জ। হার না মানা হার—দেশ ভাগ হলো কিন্তু হেঁসেল জমে গেল নানান পদে। আজকের বাঙ্গালির কাছে আবার ওই রান্নাগুলো তেমন একটা চেনাই নয়। কারণ রান্না আসলে একটা জীবনগুচ্ছ। কেবলমাত্র রান্নাঘর দেখেই আমরা যারা রান্না করি, রান্না ভালোবাসি তারা বলতে পারি, অন্তত আন্দাজ করতে পারি সমাজ, সংস্কৃতি, পারিবারিক আদব, বোধ, রুচির। রান্নাঘর ব্যক্তিরুচির থেকে সাংস্কৃতিক রুচির সূচক। হঠাৎ করে পোশাক বদল করা যায়। তিনমাসে নতুন ভাষায় কথা বলার কায়দা বেশ খানিক আয়ত্তে আনা যায়। কিন্তু রান্নার রেশ থেকে যায় যুগ যুগ ধরে। কারিকুরি চালচলনের শেষ ঠিকানা রান্নাঘর।

আজকে অধিকাংশ শহুরে বাঙ্গালির হেঁসেলে শাকপাতা কতটুকু খায়। কাটা বাছার বড্ডো হ্যাপা। কিন্তু ওটাই যে আসল বাঙ্গালির রান্না খেলা। আজকের! সে কোনকালে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম বলছেন—

''নটে রাঙা তোলে শাক পালঙ্ক নলিতা
তিক্ত ফল তাঁর শাক কলতা পলতা
সাঁজতা বনতা বন পুঁই ভদ্র পলা
নটুয়া বেথুয়া তোলে ফীরে ক্ষেতে ক্ষেতে
মহুরী শুলকা ধন্যা ক্ষীর পাই বেটে।''

শাকপাতা, ভাজা, বাটা ছাড়া বাঙ্গালির রান্নাঘর প্রমাণ করাই যাবে না। তবে আরও একবার এই প্রসঙ্গে ডালের কথা বলতেই হয়। ডাল কিন্তু আদৌ ইসলামিক আগ্রাসনের পরে আসেনি। এটা নিশ্চিত দক্ষিণের সেন রাজবংশ উত্তর-পশ্চিম থেকে ইসলাম আগ্রাসনের সময়ে কিছু আগে ডাল আনে বাঙ্গালির পাতে। আরে হ্যাঁ, আমরা বাঙ্গালিরা ধানিলঙ্কা হলেও আমাদের পাতে কাঁচালঙ্কা কিন্তু পর্তুগিজরাই এনেছে। মোদ্দাকথা, আলুভাতে কাঁচালঙ্কা যেটা আমাদের সবচেয়ে ফাঁকিবাজি পদ; তার বাহবা পরোক্ষভাবে দিতে হবে পর্তুগিজদেরই।

চাঁদসদাগরের পুত্রের বিয়ের উল্লেখ করেছি। কিন্তু বনেদি বাঙ্গালির বিয়েবাড়ি ভোজের এক চমৎকার ছবি তুলে ধরেছেন শরৎকুমারী চৌধুরানী।

''রান্না হইয়াছে পোলাও, কালিয়া, চপ, চিংড়ির মালাইকারি, মাছ দিয়া ছোলার ডাল, রুইয়ের মুড়া দিয়ে মুগের ডাল, আলুর দম ও ছক্কা। মাছের চপ, চিংড়ির কাটলেট, ইলিশ ভাজা, বেগুন ভাজা, শাকভাজা, পটোলভাজা, দই, মাছ আর চাটনি। তারপর লুচি, কচুরি, পাঁপড়ভাজা। মিষ্টান্নের একখানি সরায় আম, কামরাঙা, তালশাঁস ও বরফি সন্দেশ। ইহার উপর ক্ষীর, রাবড়ি ও ছানার পায়েস।''

চাঁদসদাগরের থেকে শরৎকুমারীর বর্ণনা যে এক গুটিগুটি রূপান্তরিত হেঁসেল তা কি আর বলার অপেক্ষা রাখে? আবার আজকের কমিউনিটি হলের বিয়ে বা যে কোনো অনুষ্ঠান মানে শরৎকুমারীর মেনুর বদলে তাতে দেখছি পোলাও, রোস্ট, কাবাব, চপ, চাইনিজ। না, এগুলো বাণিজ্যিকভাবে অনুষ্ঠানেই হাজির। বাঙ্গালির নিজের রান্নাঘরে এখনো দই কদর পায়। কদর পায় ছানার তরকারি। চর্যাপদে লেখা আছে, ''আপনা মাংসে হরিণা বৈরী'', এতটাই সুস্বাদু যে হরিণের মাংস মানুষ খুঁজে ফেরে। এখনতো আর হরিণ বধ করা যায় না। বাঙ্গালির জন্য হরিণের জনপ্রিয়তা বোধহয় মুরগির মাংসই নিয়েছে। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলে উল্লেখ আছে, বাঙ্গালির পাখির মাংস পছন্দের। মুরগি হয়তো সেই ট্রাডিশনের একটু রেশ। তেমনটাই ভেবে নিই। বিংশ শতকে বাঙ্গালির রান্নাঘর পেল রুটি। রুটি বিশেষ করে পাউরুটি তখন থেকেই মিশে গেল আমাদের সকলের খাবারে।

তবে হ্যাঁ, বাঙ্গালির মিষ্টির খাদ্যাভ্যাস বড্ডো মিষ্টি। হাতে তৈরি নাড়ু পৃথিবীর আর কেউ, কোনো জাতি করে? রকম রকম পিঠেপুলি, পায়েস— না না, জিভে জল এলেও আগে সবটা পড়তে হবে যে! বাঙ্গালির প্রাচীনকাল থেকেই মনে করে দুধের তৈরি যেকোনো মিষ্টিই দেবভোগ্য। সত্যিই তো, খাঁটি দুধের সবকিছুই পরিমিত খেলে তা স্বাস্থ্যকর, সুখকর, আনন্দকর। কিন্তু ছানা? সে তো দুধের বিকৃতি। তাই ওইটেকেই আমরা ধর্মীয় বিধানে আগেকার সময়ে অখাদ্য মনে করতাম। সুকুমার সেন 'কলিকাতার কাহিনী' গ্রন্থে লিখলেন, ''ক্ষীর মাখন ঘি দই এগুলো কাঁচা দুধের স্বাভাবিক পরিণাম,

কৃত্রিম অথবা স্বাভাবিক। কিন্তু কোনটিই দুধের বিকৃতি নয়। ছানা কিন্তু ফাটানো দুধের কৃত্রিম বিকৃতি।"

চিঠি আদান-প্রদানকালে সন্দেশ পাঠানো ছিল রীতি। তাই খবরের নাম সন্দেশ। তেতো খবর, ঝাল খবর যেমনই খবর হোক, তার নাম মিষ্টি– সন্দেশ। এতো বাঙ্গালির জন্যই সম্ভব হলো। পুরাতন কালে সন্দেশ তৈরি হতো বেসন নারকেল ও মুগের ডালের সঙ্গে চিনি মিশিয়ে। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে আছে, আমৃত গুটিকা, আমের খণ্ড , পাতপিঠা, দুঘলকলকি, মনোহরা, ক্ষীরখণ্ড, ক্ষীরপুলি, চন্দ্রপুলি, ছানাবড়া, পায়েস, নালবড়া। খেজুর রস, আখের রস দিয়ে তৈরি হতো গুড়পাটালি। মিষ্টিমুখ করেছে সবাই। ফরাসিরা এই মিষ্টি খেয়ে বলল 'এপাঁতা', ইতালিয়ানরা বলল 'ব্রাভো', আরবিয়ান বলল 'ইয়া সালাম।" আমরা ওসব বলি না। বলি আরও গোটা কয়েক দে বাপু। টপাটপ খাই। নাটোরের বনলতা সেন যত না বিখ্যাত তার চেয়েও বেশি বিখ্যাত কাঁচাগোল্লা। ভদ্রতা মানে আজকেও আমাদের হাতে মিষ্টি। খই, আতপ চালের চিড়া, কোলি চূর্ণ, হুড়ুম, মুড়কি এসবও কিন্তু আমাদেরই খাদ্যসম্ভার। আমাদের লক্ষ্মীর খোঁজ মেলে সব খাবারে। আমাদের আতিথেয়তা মানে ছিল মিষ্টির সঙ্গে সুগন্ধি মেশান ঠাণ্ডা পানীয়। কিন্তু আজ প্রবল বিশ্বায়নের যুগে বাঙ্গালির সেই টাটকা ঝরঝরে বাঙ্গালিয়ানার মিষ্টত্ব অনেকটাই ম্যারম্যারে। কেন হবে না। বোতল সোডা ঠাণ্ডা পানীয় আর বেকারির ময়দা চিনি ঠাসা বাণিজ্য খাদ্য যদি আপ্যায়নে হাজির হয় তবে কি সত্যিই স্বাদ টেকসই হয়?

প্রসঙ্গত বলি, আজ আমরা খুব শুনি যে নিরামিষ রাঁধতে পারে যে সে সব পারে। এক্কেবারেই ঠিক কথা। কিন্তু নিরামিষ রান্নার হিড়িক, তাকে জনপ্রিয় কে করেছিলেন। আর কেউই নন– স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব। মধ্যযুগে যখন আমিষ খাদ্যের বেশ দাপট, তখন চতুর্দশ শতকে বঙ্গদেশে ভক্তিবাদী আন্দোলন শুরু। যে আন্দোলন বাঙ্গালির খাদ্যাভ্যাসে ব্যাপক প্রভাব ফেলল। পঞ্চদশ শতকে 'চৈতন্যচরিতামৃতে' বাঙ্গালির নিরামিষ রসনাতৃপ্তির স্পষ্ট ছবি মেলে। যা শ্রীচৈতন্যদেবেরও অতি প্রিয় ছিল।

''পীত সুগন্ধী ঘৃতে অন্ন সিক্ত কৈল।
চারিদিকে পাতে ঘৃত বাহিয়া চলিল।
কেয়াপত্র কলার খোলা ডোঙ্গা সারি সারি।
চারিদিকে ধরিয়াছে নানা ব্যঞ্জন ভরি।।
দশ প্রকার শাক নিম্ব সুকতার ঝোল।
মরিচের ঝাল ছানাবড়া, বড়ি, ঘোল।।
দুগ্ধতুম্বী, দুগ্ধকুষ্মান্ড, বেসারি লাফরা।
মোচা ঘণ্ট, মোচাভাজা বিবিধ শাকরা।।
বৃদ্ধ কুষ্মাণ্ডবড়ীর ব্যঞ্জন অপার।
ফুলবড়ি ফলমূলে বিবিধ প্রকার।।
নব-নিম্বপত্রসহ ভৃষ্ট বার্তাকী।
ফুলবড়ি পটোলভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী।।
ভৃষ্ট-মাষ, মুদগ সূপ অমৃতে নিন্দয়।
মধূরান্ল বড়াম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয়।
মুদগবড়া বড়াম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয়।।
মুদগবড়া মাষবড়া কলাবড়া মিষ্ট।
ক্ষীরপুরী নারিকেলপুলী আর যত পিষ্ট।।

এর পাশাপাশি চৈতন্যদেব খেতেন নিমবেগুন, পটোলভাজা, ফুলবড়ি ভাজা, মুগের ডাল। অত্যন্ত পছন্দের পদ ছিল দুধলাউ। চৈতন্যভাগবতে শচীমায়ের হাতে দুগ্ধ-লকলকি দিয়ে নিমাইয়ের ভোজনের কথা বারবার এসেছে। মধ্যযুগীয় বৈষ্ণবদের পাতের শেষে থাকত তেঁতুল ঝোল। জলপাই টক। তাম্বুল কর্পুরে রসনা সমাপ্ত হতো। তবে 'নরোত্তম বিলাস' বলছে, বৈষ্ণবরা পানে সুপারির বদলে হরিতকী গ্রহণ করতেন।

কখনও কখনও মনে হয় এই বোধ বাঙ্গালি বিধবাদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। বৈধব্যের যন্ত্রণা এক সময় এ মাটিতে দুর্বিষহ ছিল। হাজার 'না'-এর ভিড়ে এই নিরামিষ হেঁসেল টুকুই হয়তো তাদের এক টুকরো ভালো লাগার দ্বীপ ছিল। ভোজন শিল্পী বাঙালি বুদ্ধদেব বসু উল্লেখ করেছেন, ''আশ্চর্য হল নিরামিষ রন্ধনশৈলী, যাকে বলা যায় বৈধব্যপ্রতার উপজাতক। শুনতে অদ্ভুত কিন্তু কথাটা সত্য, যে এই উপবাসকারিণী একাহারিণী ভগিনীদের হাতেই বাঙ্গালি রান্না পেয়েছে তার সূক্ষ্মতা, সুকুমারতম ব্যঞ্জনা—যদিও ভক্ষ্য বিষয়ে শত শাসনে তাঁরা আবদ্ধ, অথবা হয়তো সেইজন্যেই। ইয়োরোপের মধ্যযুগে যেমন খ্রিস্টান পাদরিরা, তাদের সংসারচ্যুত মঠের নিভৃতে, ধীরে ধীরে জারিত করেছিলেন দ্রাক্ষারস থেকে অভিনব মদিরাপর্যায়, তেমনি আমাদের বিধবারা, সব খ্যাতিমান সুখাদ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে সমাজের উপর মহৎ প্রতিশোধ নিয়েছিলেন রসনার সূক্ষ্ম তর বোধ উদ্রেক করে, বাঙ্গাল ভাষায় যাকে বলে 'তার'। পেঁয়াজ যাদের নিষিদ্ধ, গরমমশলা নিষিদ্ধ, এমনকী মুসুরডালের মতো নিরীহ শস্যও চলে না..... এ অবস্থায় তাঁরা হাত পাকিয়েছেন একটি নতুন স্টাইলে অসামান্য রচনাশক্তির পরিচয় দিয়ে।"

বৈষ্ণব খাদ্যরীতিতে এককালের বিধবারা ছিলেন বলেই হয়তো আজকেও আমাদের রসনায় নানান নিরামিষ পদ থেকে গেছে। যখন সাবেক রান্নায় কোর্মা, মোগলাই, পোলাও, ওমলেট, টোস্ট, কাটলেট, পুডিং, স্টু, কাস্টার্ড। তখনও বেঁচে

রইল ভাত ডাল শুক্তো ডালনা ঘণ্ট। যখন জিভে জল আনছে সাবেকি রান্না। তখনও স্বাস্থ্য দফতর সামলে চলল ওই বিধবাদের নানান নিরামিষ পদ। এ কৃতজ্ঞতা পরিমাপতুল্য নয়! তারা নিঃশব্দে কত পদ, কাটা, বাছা, ভাজা করতে করতে হাজার পরীক্ষা করেছেন। তাই আজকেও রান্নার ন্যাকা ন্যাকা রিয়্যালিটি শোতে নিরামিষ পদ এপিসোড হয়। বিজ্ঞাপন আসে।

তবে হ্যাঁ, বাঙ্গালির রন্ধন কৌশলকে, বাঙ্গালিয়ানাকে আধুনিক কালের মধ্যে যদি কেউ অমর করে যান তবে তিনি বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়। তাঁর ধ্রুপদী সৃষ্টি 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' এক নিখুঁত হেঁসেলের কথা। যে উপন্যাসের ঠাকুর হাজারি দেবশর্মা, সেই হলো কেন্দ্রীয় চরিত্র। তার ওপর কত গঞ্জনা, সে শোষিত, দরিদ্র। কিন্তু তার মনে হলো একটা খাবার ঘর বানানোর যেখানে পাত পেড়ে মানুষ খাবে। যেখানে ডালে ফ্যান দেওয়া হবে না। যেখানে রান্না হবে এক শিল্প। তাই কোনো ফাঁকি, কোনো ভেজাল থাকবে না তাতে। সেই হাজারিও কিন্তু রান্না শিখল তাদের এড়োশোলা গ্রামের এক প্রাচীনা ব্রাহ্মণ বিধবা মহিলার কাছ থেকেই। সেই বিধবা ব্রাহ্মণীর রান্নায় অসাধারণ খ্যাতি। সেই গুণ তিনি যেন দিয়ে যেতে চাইলেন হাজারির মধ্যে। হাজারির মা মূলত সেই বৃদ্ধা খুড়িমার থেকে নিরামিষ পাঁচমিশালি চচ্চড়ির গুণ রেসিপি দিলেন। তাই যে পদ দিয়ে নিবন্ধ শুরু হয়েছিল, সেই চচ্চড়ি আবার এল পড়ার লেখার পাতে। চচ্চড়ি নামেই চচ্চড়ি কিন্তু তার মাপ, পরিমাণ, অনুপাত কোনো বিজ্ঞান গবেষণার চাইতে সামান্যও কম নয়। যে রাঁধে সে জানে, চেটেপুটে যে খায় সে বোঝে। ও হ্যাঁ, হাজারি ঠাকুর মাংস রান্নারও বিশেষ পদ্ধতি বার করেছিল। জল ছাড়া নেপালি স্টাইলে রান্না যা তিনি শিখেছিলেন নেপাল ফেরত ডাক্তার শিবচরণ গাঙ্গুলীর স্ত্রীর কাছ থেকে। তাই আজ যখন শখে রান্নার জন্য বাঙ্গালির একাংশ রান্নার বই হাতড়ায় তখন মনে হয় রেসিপি কখনো বইতে থাকে না। রেসিপি আসলে জাদু। সেই হাতের জাদুবিদ্যা রপ্ত করতে হয়। জমিদার কন্যা অতসী যখন দরিদ্র হাজারি ঠাকুরকে রান্না শেখাতে বলছে তখন হাজারির বক্তব্য ছিল, ''ভাল রান্না শেখা একদিনে হয় না মা। মুখে বলে দিলেও হয় না। তোমার পেছনে আমায় লেগে থাকতে হবে অন্তত ঝাড়া দু-তিন মাস। হাতে ধরে বলে দিতে হবে তুমি রাঁধবে। আমি কাছে দাঁড়িয়ে তোমার ভুল ধরিয়ে দেবো। এ না হলে শিক্ষা হয় না।.....''

আমাদের বাঙ্গালির স্বাদ অনেক রূপান্তরের পরেও তার বাঙ্গালিয়ানা ধরে রেখেছে, কারণ আনাচে কানাচে আজকেও হাজারি ঠাকুররা আছেন। রাঢ়বঙ্গে টাটকা ইলিশের টক কিংবা বুদ্ধদেব বসুর কবিতার ''... তারপর কলকাতার বিবর্ণ সকালে ঘরে-ঘরে ইলিশ ভাজার গন্ধ; কেরানির গিন্নির ভাঁড়ার সরস সর্ষের ঝাঁজে।...''

এই ঝাঁঝটাই আমাদের সম্পদ। ঝাঁঝের জোরেই আমাদের হেঁসেল ও মুখ দুইই চলে। আমাদের রান্নার ঠ্যালা কেমন? তার অপ্রতিরোধ্য বর্ণনা করলেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় 'কালের মন্দিরা'- তে—''ওদিকে পারসিকেরা অঙ্গার কুণ্ড প্রস্তুত করিয়া শূল্য মাংস রন্ধন করিতেছে; দগ্ধ মাংসের বেশার....মিশ্র সুগন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিকে লুব্ধ করিয়া তুলিতেছে।....''

এইটাই আমাদের অহংকার, আমাদের শ্লাঘা। বিশ্বব্যাপী আমাদের নাম। বাঙ্গালির রান্না যার গন্ধেই অর্ধেক ভোজন সারা যায়। জাতিশুদ্ধতা একটা কল্পনা। তা বিশ্বের ইতিহাসে কোন জাতি রাখতে পারল? কিন্তু প্রভাব নামক এক বিষয় জাতিশুদ্ধতার বিষম বস্তু। আমাদের রান্নাঘর সেই প্রভাব রেখেছে সারা বিশ্বে। তাতে পর্তুগিজ থেকে আরবি সবাই এসেছে মিশেছে কিন্তু রান্নার শেষ প্রভাবে, নামে, যশে থেকে গেছে বাঙ্গালির রন্ধন ষষ্ঠেন্দ্রিয় জোর। বাঙ্গালির জীবনের আত্মপরিচয় তার রান্নাঘর। খাওয়া খাওয়ানো। কে দেবে এমন করে সাজিয়ে?

''শিউলি ফুলের মত সাদা সুগন্ধী সরু চালের ভাত। পাশেই রাখা কাঁসার ছোট বাটিতে সোনা রঙের গাওয়া ঘি। হালকা সবুজ রঙের কাগজি লেবু আর গাঢ় সবুজ কাঁচালঙ্কা। ঝিরঝিরে আলুভাজা, মুচমুচে কাচকি মাছের ঝুরি। কুচি কুচি নিমপাতা আর খেসারির ডালের বন্ধনে ভাজা বড়া। ক্রিম রঙের সুস্বাদু নারকোল চিংড়ি। কুচকুচে কালো কইমাছ টুকটুকে লাল তেলের বিছানায় ফুলকপির বালিশে শোয়ানো। রূপোলি ইলিশের সোনালি রাইসর্ষের সাথে রাজযোটক। ল্যাজমুড়োর সাথে কচি কুমড়োর কালজিরে ছিটানো ঝোল। ধনেপাতা, নারকেল আর কচুশাকের অপরূপ মেলবন্ধন। তেজপাতার সুগন্ধে ভরা নারকেল কোরা ছড়ানো ঘন মুসুরি ডাল। আদা পেঁয়াজ আর খণ্ড খণ্ড আলুর সঙ্গে বনেদি মাটন। মাংসাল মাগুরের মেজাজি কালিয়া।'' (মেঘ বৃষ্টি রোদ, বুদ্ধদেব বসু)।

আহা! আর কি কিছুই বাকি রইল ?এসব দেখবে, খাবে আর সবাই সব জাতি লুচির মতো ফুলবে। কারণ এ স্বাদের ভাগ দেব কিন্তু এ ঐতিহ্য স্বাদের ভাগ হবে না।

বাঙ্গালির রান্না এক অখণ্ড অভিধান। যে অভিধান এক অভিযানের আঁক বাঁক। কখনও বদলেছে, কখনও মিশেছে , কখনও মিলেছে—কিন্তু তার আদ্য, মধ্য ও অন্ত্যবর্ণ যোগে রয়েছে স্বাদ। স্বাদ বলে যে কি বল, তা আমরাই শেখালাম বিশ্বকে।

HAR GHAR SIP

SIP is one of the simplest ways to Invest and Create your Wealth.

Start an SIP

Take The First Step to

FINANCIAL FREEDOM!

Mr Debashis Dirghangi CFP®

AMFI REGISTERED MUTUAL FUND DISTRIBUTORS

DRS INVESTMENT

PMS | MUTUAL FUND | INSURENCE | MEDICLAIM | FD | BOND

Website: https://drsinvestment.com
Email.: drsinvestment@gmail.com

Contact @ 9748978406 / 8240685206

With Best Compliments from -

A

Well wisher

লোকক্রীড়া

ড: মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়

আদিম মানুষ ছিল গোষ্ঠীতে বিভক্ত। গোষ্ঠীগুলি সবসময়ই একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। যুদ্ধের প্রাপ্তি ছিল খাদ্য, ফসল, নারী, রত্ন ইত্যাদি। যুদ্ধে জয়ী ও পরাজিত—এই দুই বিবাদমান গোষ্ঠীর প্রতিযোগিতা চলত নিরন্তর। জীবন ধারণের তাগিদে গড়ে ওঠা এই প্রতিযোগী মনোভাব পরবর্তীকালে মানুষ যখন কৃষি সভ্যতায় এল, তখনো ছেড়ে দিতে পারল না। তখন গোষ্ঠীযুদ্ধ পরিণত হলো ক্রীড়ায়। সুসজ্জিত, নিয়ম করে বানানো এক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে মানুষ তাদের প্রতিযোগী মনোভাবকে দমন করতো, দুই বা ততোধিক গোষ্ঠীর সমাবেশে যখন এক-একটি গ্রাম গড়ে উঠলো, তখন সেই গ্রামগুলির কৃষি, জলবায়ু, ভূপ্রকৃতি, মৃত্তিকা, গাছপালা ইত্যাদি অনুসারে নিজস্ব লোকায়ত জীবনচর্যা গড়ে উঠলো। প্রতিটি লোকায়ত সমাজের নিজস্ব কিছু ক্রীড়া-প্রক্রিয়া গড়ে উঠলো।

লোকক্রীড়ার বৈশিষ্ট্য ঃ

।।এক।।

কোনো একটি বিশেষ সমাজের একেবারে নিজস্ব সম্পদ হলো লোকক্রীড়া। আঞ্চলিক উপাদান ও উপকরণ সহযোগেই লোকক্রীড়া গড়ে ওঠে। যেমন—কোনো একটি লোকায়ত সমাজে যদি বিস্তীর্ণ প্রান্তর থাকে, সেখানে খোলা মাঠের খেলার প্রচলন থাকবে, আবার পার্বত্য অঞ্চলের স্বল্প সমভূমি সমন্বিত ছোটো ছোটো গ্রামগুলিতে ছোটো স্থানে সংঘটিত হতে পারে এমন ক্রীড়াই প্রচলিত থাকবে।

।।দুই ।।

লোকক্রীড়া লোকায়ত জীবনের পরতে পরতে গড়ে ওঠে। নদীমাতৃক গ্রামবাঙ্গলার 'বাম-দাহিন যে। খাল-বিখলা' (চর্যাপদ)। তাই সাঁতার কেটে সমবয়সি বন্ধুকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়াও একটা লোকক্রীড়া। এই ক্রীড়াগুলি এতই স্বতঃস্ফূর্ত যে অনেক সময় কেন্দ্রীয় সমাজের সুপরিকল্পিত ক্রীড়ার মতো এগুলি সুসজ্জিত নয়। নিয়ম থাকলেও নিয়মের কঠোরতা নেই, জয়-পরাজয় থাকলেও আনন্দই মুখ্য। কোনো পোশাক আশাকের বাধ্যবাধকতা নেই। তবে বাস্তব জীবনের প্রাণের উষ্ণতায় লোকক্রীড়াগুলি আজও উজ্জ্বল।

।।তিন ।।

লোকক্রীড়া অনেক সময় উৎসব, আচারের অঙ্গ হিসাবে অনুষ্ঠিত হয়। বর্ষায় যখন সবজি অথবা মাছের অভাব হবে, তখন যাতে গৃহস্থ বাঙ্গালি সন্তানসন্ততি নিয়ে খেয়ে-পরে

বেঁচে থাকতে পারে তার জন্য বাঙ্গলার লোকায়ত সমাজে প্রচলিত আছে নানা প্রকার ফসলোত্তর প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি। যেমন—ছাতু, বড়ি, সুঁটকি, আচার, তেল, সত্ত ইত্যাদি। লোকায়ত সমাজ নানারকম উৎসবের মধ্য দিয়ে এই প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতিকে কার্যে রূপায়িত করে। যেমন—ছাতুসংক্রান্তি, বড়ি উৎসব ইত্যাদি। উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় শীতের সময় ঘরে ঘরে দেওয়া হয় বড়ি। বিউলির ডাল বেটে, চালকুমড়োর ছাঁচ দিয়ে ফেটিয়ে নিয়ে বাঙ্গালি বধূরা স্নান করে, পরিচ্ছন্ন বসনে বড়ি দিতে বসেন। কুলো বা চ্যাঙারিতে পাতলা একটি কাপড় বিছিয়ে দেওয়া হয়, একেবারে প্রথমে পাত্রের মাঝখানে দুটি বড়ো বড়ো বড়ি দেওয়া হয়, যাকে বলা হয় বুড়ো-বুড়ি। এদের মাথায় দূর্বা, গায়ে সিঁদুরের টিপ দেওয়া হয়। গৃহের প্রবীণা এই দুটি বড়ি দেন। তারপরে সকলেই বড়ি দিতে থাকেন পাশ দিয়ে। ঠিক এই সময় ছাতে বা দাওয়ায় বাড়ির ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েরা একটি লোকক্রীড়ায় মেতে ওঠে। তারা দুটি দলে ভাগ হয়ে যায়, একদল একটি ছড়া হাততালি দিয়ে বলে—'চিংড়ি মাছের চড়চড়ি, তাতে দিলাম ফুলবড়ি, ফুলবড়িটা গলে গেল, সবাই মিলে একপা তোলো। অপর দল ছড়া বলার সময় ঘুরতে থাকে, শেষ লাইনটি বলা মাত্রই তারা এক পা তুলে দাঁড়ায়। প্রথম দল চেষ্টা করে তাদের স্পর্শ না করে পা'টি ফেলে দেওয়ার। দ্বিতীয় দলের যারা পা সবচেয়ে বেশি সময় তুলে রাখতে পারে, সেই সমস্ত খেলায় বিজয়ী বলে ঘোষিত হয়।

।। চার।।

লোকক্রীড়ার মধ্য দিয়ে লোকায়ত সমাজের চিত্র প্রাচীনকাল থেকে বয়ে আসছে। যেমন, লোকায়ত সমাজের এক জনপ্রিয় খেলা হল 'এলাডিং বেলাডিং শৈল।' এই খেলায় দুটি দল থাকে। দুটি দলের মধ্যে প্রশ্নোত্তর চলতে থাকে। প্রশ্নোত্তর পর্বটি এইরকম—

প্রথম দল ঃ এলাডিং বেলাডিং সই লো

দ্বিতীয় দল ঃ কীসের খবর আইল?

প্রথম দল ঃ রাজামশাই একটি বালিকা চাইল?

দ্বিতীয় দল ঃ কোন্ বালিকা চাইল?

প্রথম দল ঃ .... (দ্বিতীয় দলের) বালিকা চাইল। .....

এই প্রশ্নোত্তর থেকে মনে হয়, দুটি দলের মধ্য দিয়ে সমসাময়িক বাঙ্গলার শ্রেণীবিভক্ত সমাজের চিত্র ভেসে ওঠে। শাসকশ্রেণী ক্ষমতার বলে হয়ে উঠেছিল অত্যাচারী, নারীলোলুপ। সমাজের শাসকশ্রেণী ওরফে রাজামশাই তাই রাজকর্মচারীদের নিয়ে নির্দ্বিধায় লজ্জাহীন চিত্রে গ্রামের একটি নিষ্পাপ যুবতীকে তুলে আনতেন। ক্ষমতাহীন, শোষিত গ্রামের সরল সাধারণ মানুষ রাজামশাইয়ের ভয়ে সবসময় ভীত থাকতেন। খাজনা, কর এসবের প্রবল প্রকোপ থেকে নিজেদের গ্রামকে বাঁচাতে গ্রামের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটিকে তারা সামাজিকভাবে বলিপ্রদত্ত করতেন। লোকক্রীড়ার মধ্য দিয়ে বাঙ্গলার লোকায়ত সমাজের মন-বিদীর্ণ করা এক করুণ চিত্র ভেসে ওঠে।

।। পাঁচ ।।

লোকায়ত মনস্তত্ত্ব লোকক্রীড়ার সময় ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। যেমন—কাবাডি খেলায় কোনো খেলোয়ার যদি খেলা থেকে বেরিয়ে যায়, তার সম্পর্কে 'মরে যাওয়া' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। লোকায়ত মানুষের প্রতিযোগিতামূলক ভাবনা ও গোপন যুদ্ধপ্রীতি কোথাও যেন ওই শব্দদুটির মধ্যে নিহিত আছে। গোষ্ঠী যুদ্ধে রাশি রাশি সৈন্যের মৃত্যু ঘটত, তারই একটা প্রচ্ছন্ন স্মৃতি কালস্রোতে লোকক্রীড়ার মধ্যে থেকে গেছে।

।। ছয় ।।

লোকায়ত সমাজের বৈশিষ্ট্য হলো একটি বিশেষ লোকের সদস্যরা তাদের জীবনচর্যার জন্য যা কিছু প্রয়োজনীয়, শুধু তাকেই লালন করে। অপ্রয়োজনীয় জীবনচর্যা কালস্রোতে হারিয়ে যায়। লোকক্রীড়ার ক্ষেত্রেও এই একই বৈশিষ্ট্য প্রযোজ্য। প্রতিটি লোকক্রীড়ার কোনো সুনির্দিষ্ট উপযোগিতা অবশ্যই যে লোকসমাজ থেকে ক্রীড়াটি উঠে এসেছে, সেখানে থাকবে। নচেৎ ওই খেলা লোকক্রীড়া হিসাবে লোকসমাজ কর্তৃক লালিত ও পরবর্তী প্রজন্মে প্রবাহিতই হবে না।

লোকক্রীড়ার শ্রেণীবিভাগ

১) বয়স অনুসারে লোকক্রীড়া তিন ভাগে বিভক্ত। (ক) শিশুদের জন্য, (খ) যুবক/যুবতীদের জন্য এবং (গ) বৃদ্ধ/বৃদ্ধাদের জন্য।

১। (ক) রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'জগৎ পারাবারের তীরে / শিশুর মহামেলা।' মহাজীবনের কাছে সত্যই সব মানুষ শিশুর তুল্য। বাঙ্গলার লোকায়ত সমাজে শৈশবটি বেশ প্রলম্বিত। জন্মের পর থেকে শিশু যখন আধো আধো কথা বলতে শেখে, নরম নরম পা মাটিতে ফেলে হাঁটতে শুরু করে, তখন তার চোখে অবাক বিস্ময়, বড়ো বড়ো জিজ্ঞাসু চোখে সে চারপাশের পৃথিবীকে দেখে আর অনুকরণ করে। বাঙ্গলার লোকসমাজে পারিবারিক বন্ধন অতি দৃঢ়। প্রতিদিন ছোটো শিশু ঠাকুমা-দিদিমা-মা-জেঠি-কাকিমাকে রান্না করতে দেখে। দাদু-জেঠু-বাবা-কাকুকে বাজার করতে দেখে, দাদা-দিদিকে

পড়তে, লিখতে দেখে, সেগুলিই আপন মনে অনুকরণ করে, কখনো খেলনা-বাটি খেলে, কখনো বাজার করা খেলে, কখনো স্কুল-স্কুল খেলে। একটু বড়ো হয়ে সে যখন পাঠশালা যায়, আরও দু-একজন বন্ধু জোটে, তখন সে ঘুড়ি ওড়ানো খেলে অথবা গুলতি মারা, ইক্‌ড়ি-মিক্‌ড়ি খেলা চলতে থাকে। আরও একটু বড়ো অর্থাৎ সাত থেকে বারো বছর বয়স পর্যন্ত লুকোচুরি, গুলি খেলা, এক্কা-দোক্কা ইত্যাদি অজস্র খেলা খেলে। এই খেলাগুলির মধ্য দিয়ে বাঙ্গলার শিশু অনুকরণের অবোধ জগৎ থেকে মানসচর্চা ও শরীরচর্চার দিকে এগিয়ে যায়। ইক্‌ড়ি-মিক্‌ড়ি জাতীয় খেলায় থাকে স্মৃতিশক্তি তৈরি করার মতো বড়ো বড়ো ছড়া, এক্কা-দোক্কা বা গুলি খেলায় থাকে গাণিতিক হিসাব মেলানোর প্রক্রিয়া, ঘুড়ি ওড়ানো, লুকোচুরি খেলায় থাকে শারীরিক কসরৎ আর গুলতি মারার মতো খেলায় থাকে দৃষ্টিশক্তি ও মনোনিবেশ তীক্ষ্ণ করার অভ্যাস।

১। (খ) **যুবক/যুবতীদের জন্য ঃ** পল্লীকবি বলেন, 'মৎস্য ধরিয়া খাইব সুখে'। মাছধরা বাঙ্গলার গ্রামের যুবকদের নেশা ও পেশা। মেয়েরাও পিছিয়ে নেই। স্নান করতে গিয়ে আঁচল বিছিয়ে পানা তোলে আর তার তলায় থাকা চুনো চিংড়ি, ছোটো মাছ আঁচলে বেঁধে নেয়। কবিগুরু এদৃশ্যের বর্ণনা করেছেন—''রাশি রাশি তুলি শৈবাল দল / ভরিয়া লয়েছে লোল অঞ্চল।' কাবাডি, হাডুডু, ডাংগুলি, হিঁয়ে-দড়ি, এক্কা-দোক্কা, পুতুলখেলা, লুকোচুরি, চোর-পুলিশ, আগডুম-বাগডুম, এলাটিং-বেলাটিং, আমপাতা এসব খেলা যুবক/যুবতী উভয়েই খেলে থাকে। এর মধ্যে আবার কোনো কোনো খেলায় মজার ছড়া থাকে। যেমন, আমপাতা খেলায়। দুজন মুখোমুখি হাত উঁচু করে ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে। বাকি খেলোয়াররা রেলগাড়ি মতো একে অপরের কোমর ধরে উঁচু করা হাতের তলা দিয়ে সার বেঁধে এগিয়ে যায় আর বলে—''আমাপাতা জোড়া জোড়া / মারবে চাবুক চলবে ঘোড়া / ওরে বিবি সরে দাঁড়া / আসছে আমার পাগলা ঘোড়া / পাগলা ঘোড়া ক্ষেপেছে / বন্দুক ছুঁড়ে মেরেছে / অলরাইট ভেরি গুড / মিস্ খায় চা বিস্কুট।' এই ছড়া শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই যারা হাত তুলে দাঁড়িয়ে ছিল, তারা হাত দুটি নামিয়ে দেয়। ফলে সেই ফাঁদে কোনো খেলোয়াড় ধরা পড়ে, সেই খেলোয়াড় মোর (মরা) বলে ঘোষিত হয়ে। সে সাময়িকভাবে বাদ পড়বে, আবার খেলা শুরু হবে। স্মৃতিশক্তির চর্চার সঙ্গে সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ছন্দময়তা শেখাও এই খেলাটির উদ্দেশ্য বলে মনে হয়। বাঙ্গলায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রসারলাভের স্পষ্ট চিত্র ছড়াটির শেষদুটি পঙ্‌ক্তিতে স্পষ্ট প্রকাশিত।

১। (গ) **বৃদ্ধ/বৃদ্ধাদের জন্য ঃ** বয়স্কদের প্রিয় খেলা হলো মাছধরা। তবে এটি বাঙ্গলার লোকায়ত সমাজে মূলত পুরুষদেরই খেলা। এছাড়া তাস, দাবা, পাশা, লুডো প্রভৃতি খেলা নারী-পুরুষ উভয়ই খেলে। এগুলি একস্থানে বসে

মূলত বুদ্ধির খেলা। এছাড়াও একস্থানে বসে আরও কিছু খেলা হয়, যেমন নামের লড়াই, স্থানের লড়াই, অন্ত্যাক্ষরী ইত্যাদি। 'নামের লড়াই' খেলায় গোল হয়ে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা বসেন, একজন শুরু করেন একটি নাম দিয়ে, যেমন ধরি একজন ব্যক্তি বললেন, রাম, তার পাশের ব্যক্তি বললেন রাম, লক্ষ্মণ বা রাম, কৃষ্ণ, তৃতীয় ব্যক্তি বললেন রাম, লক্ষণ, ভরত অথবা রাম, কৃষ্ণ, বামন— এইভাবে খেলাটি ক্রমাগত স্মৃতির উপর নির্ভর করে এগিয়ে যাবে। কোনো ব্যক্তি যদি স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে একটি ক্রম বাদ দিয়ে ফেলেন, তাহলে তিনি মরে যাবেন। আর খেলবেন না। তারপরের ব্যক্তির দিকে খেলা এগিয়ে যাবে। বৃদ্ধ বয়সে স্মৃতিভ্রম হওয়া স্বাভাবিক, সেজন্য স্মৃতিশক্তির চর্চা এসময় বিশেষ প্রয়োজনীয়। সেক্ষেত্রে এসব ক্রীড়া বিশেষভাবে উপযোগী।

২। **স্থান অনুসারে লোকক্রীড়া তিন প্রকার—(ক) একস্থানে বসে ঘরোয়া খেলা, (খ) সীমাবদ্ধ এলাকায় খেলা, (গ) বড়ো ক্ষেত্রে খেলা।**

২ (ক) **একস্থানে বসে ঘরোয়া খেলা**—বাঙ্গালির কৃষি-জলাবায়ু ফসল উৎপাদনের পক্ষে এতটাই সহায়ক, সে বাঙ্গলার লোকায়ত জীবনে অবসর কম, কঠিন কাজ করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল উৎপাদন করা, ফসলোত্তর প্রক্রিয়াকরণ করা, জমিকে পুনর্চাষের যোগ্য রাখা—এভাবেই কাটে লোকায়ত বাঙ্গালির জীবনচর্যা। তবুও শৈশবে, বার্ধক্যে, অতিবর্ষণে, উৎসবে বাঙ্গালি যখনই অবসর পায়, তখনই মেতে ওঠে আনন্দে। অবসর বিনোদন, আনন্দ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বুদ্ধির চর্চার জন্য থাকে বেশ কয়েকটি ঘরোয়া খেলা। যেমন—ইক্‌ড়ি মিক্‌ড়ি, কলাগাছ, তাস, দাবা, পাশা, নামের লড়াই, তাল-খেজুর কাট, ইচিং বিচিং ইত্যাদি। বর্ষাকালে সারাদিন ঝর ঝর ধারা বয়ে চলেছে। বাইরে বেরোনোর অবকাশ নেই, ছোটো শিশুরা ঘরের কোণে জড়ো হয়ে খেলা শুরু করে। সকল শিশু তাদের এক দলপতি নির্বাচন করে, যাকে বলা হয় রাজা। তারপর সকল শিশু দুটি হাতের তালু প্রসারিত করে। রাজা একটি হাত প্রসারিত করে। রাজা প্রতিটি আঙুল স্পর্শ করে এবং একটি ছড়া বলে—'ইচিং বিচিং চাম চিচিং / চাঁদি কাটা মজুমদার / ধেয়ে এলো দামুদর / দামুদরের হাঁড়িকুড়ি / দুয়ারে বসে চাল কুঁড়ি / চাল কাঁড়তে হলো বেলা / ভাত খাও গে দুপুর বেলা / ভাতে পড়ল মাছি / কোঁদাল দিয়ে চাঁছি / কোদাল হলো ভোঁতা / খাও কামারের মাথা' (এই ছড়াটির অনেক কথান্তর আছে)। সেখানে ছড়াটি শেষ হয় সেই আঙুলটি রাজা মুড়িয়ে রাখে। এমনি করে খেলাটি চলতে থাকে। যে শিশুর সবকটি আঙুল সবার আগে মুড়িয়ে যাবে, সেই খেলার বিজয়ী হিসাবে গণ্য হবে। ইচিং-বিচিং খেলারই কথান্তরিত রূপ হলো ইক্‌ড়ি-মিক্‌ড়ি খেলা। আপাত নজরে

এই খেলার ছড়াটিকে শিশুদের অর্থহীন প্রলাপ মনে হলেও এর মধ্যে বাংলার কৃষি সমাজের বেচাকেনার একটি বাণিজ্যিক দিক ব্যঞ্জনায় ফুটে উঠেছে। তাছাড়া শিশুর স্মৃতিশক্তি অভ্যাস, গণিতচর্চা—দুটিই হচ্ছে একাধারে। বৃষ্টিমুখর একঘেয়ে দিনে হঠাৎ করে শিশুদের আনন্দিত কণ্ঠমুখর গৃহ পরিবেশ সুখকর এবং গৃহস্থের পক্ষে আনন্দদায়কও বটে।

২। (খ) **সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে খেলা ঃ** গ্রামবাঙ্গলার মানুষ সারা দিন কঠোর পরিশ্রম করে সংসার পালন করে। কোনো সময় স্বল্প অবসরে একটু ক্রীড়াপ্রবণ হয়ে ওঠার জন্য বাঙ্গলার লোকায়ত সমাজে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে কিছু খেলার প্রচলন আছে। যেমন— এক্কা-দোক্কা, আমপাতা, এলাটিন-বেলাটিন, গাদি, খো খো, কুঁয়ো- কুঁয়ো প্রভৃতি। এই খেলাগুলি বাড়ির উঠোনে বা সবজীবাগানের পাশে অল্প ফাঁকা জায়গাতেই খেলা যায়। বাড়ির শিশুরা বা কিশোররা একসঙ্গে গৃহের উঠানে জড়ো হয়। প্রথমে নির্বাচিত হয় রাজা। রাজা ছাড়া বাকিরা হাত ধরাধরি করে একটি বৃত্ত তৈরি করে। এই বৃত্তটি হলো কুঁয়ো। বৃত্ত তৈরি করা শিশুরা বৃত্তাকারে ঘোরে এবং সমবেত কণ্ঠে বলে 'কুঁয়ো চাই, কুঁয়ো চাই'। রাজা কুঁয়ো দেখতে চাইলে শিশুর দল কাছাকাছি চলে এসে কুঁয়োর পরিসর ছোটো করে দেয়। রাজা প্রশ্ন করে 'কুঁয়ো কেন ছোটো?' শিশুর দল বলে 'কড়ি ফেল্, পাবি জল'। তখন রাজা কুঁয়োর মধ্যে একটি ঢিল ফেলে দেয়। শিশুর দল হাত প্রসারিত করে বৃত্তটি বড়ো করে। রাজা কুঁয়োর জল মাপার অনুমতি পায়। সে বৃত্তের মধ্যে ঢুকে পড়ে সে পায়ের পাতা স্পর্শ করে বলে 'এতটুকু জল?' শিশুর দল বৃত্তাকারে ঘুরতে ঘুরতে সমবেত ভাবে বলে 'ঘাগ্‌গো তোল' রাজা এরপর হাঁটু, কোমর, বুক, মাথা স্পর্শ করতে থাকে এবং খেলাটি এগিয়ে যেতে থাকে। মাথা অবধি জল উঠে গেলে রাজা কোনো একটি হাত-শৃঙ্খল স্পর্শ করে বলে 'এখান দিয়ে পালাবো' শিশুর দল ঘুরতে ঘুরতে বলে 'বন্দুক ছুঁড়ে মারবো। রাজা একেকটি হস্তশৃঙ্খল স্পর্শ করে পালানোর কথা বলে আর শিশুর দল বিভিন্ন অস্ত্র দিয়ে তাকে মারার কথা বলে। কোনো একটি দুর্বল হস্ত-শৃঙ্খল দেখে রাজা পালায়। শিশুর দল তাকে ধরে ফেলে দণ্ড প্রদান করে। দণ্ডটি হলো শিশুর দল যা বলবে, রাজাকে তাই করতে হবে। অবশেষে শিশুরদল বলে 'খেলা হলো শেষ, চোর মুক্ত দেশ।' রাজা ও রাজকর্মচারীদের অকুণ্ঠ অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের প্রতিবাদী কণ্ঠ এই ক্রীড়াটির মধ্য দিয়ে ভেসে আসে। শিশুদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া, সমবেত কণ্ঠে পাঠ করা, সমবেত ছন্দে পা ফেলা—এগুলি এই খেলার মধ্যে দিয়ে শেখা যায়।

২। (গ) **বড়ো ক্ষেত্রে খেলা ঃ** নদীমাতৃক বাঙ্গলায় গঙ্গা ভাগীরথীর বদ্বীপ বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো সমতল ভূমি। বাঙ্গলার পল্লী মানেই কৃষিক্ষেত্র, বিশাল দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ, ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোটো ছোটো গ্রামগুলি। বিশাল মাঠে লোকায়ত বাঙালি খেলে কাবাডি, হাডুডু, ঘুড়ি ওড়ানো, লুকোচুরি, গুলতি ছোঁড়া, ভাটা খেলা ইত্যাদি। বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রে একটি এক বিঘা (লোকপরিমাপ, তর্জনির মাথা থেকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠর মাথা পর্যন্ত বিস্তৃত অবস্থায়, প্রায় ছয় ইঞ্চি) ব্যাসের একটি অগভীর গর্ত করা হয়। সেখান থেকে সোজাসুজি ছয় হাত দূরে কাঁচের গুলি সাজানো হয়, সাধারণত বারোটি গুলি থাকে। বড়ো সাদা মার্বেলের গুলি দিয়ে খেলোয়াড়কে দলপতি কর্তৃক নির্দিষ্ট করে দেওয়া কাচের গুলিকে অগভীর গর্তে ফেলতে হয়। এই খেলার নাম ভাঁটা খেলো। বড়ো মার্বেলের গুলিটিকে লোকায়ত মানুষ বলেন 'ভাঁটা'। তাই এই খেলার নাম ভাঁটাখেলা। ভাঁটাখেলা দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতা বাড়ানো ও লক্ষ্যভেদ অভ্যাস করার এক লোকায়ত পদ্ধতি।

৩। **খেলোয়াড়ের সংখ্যা অনুসারে লোকক্রীড়া তিন রকমের— (ক) একজনের খেলা, (খ) দুজনের খেলা, (গ) বহুজনের খেলা।**

৩। (ক) **একজনের খেলা ঃ** বাঙ্গালির গোলায় গোলায় যখন ধান উঠে যায়, আনন্দে তাদের গলায় গলায় গান শোনা যায়। পরিশ্রম সার্থক হবার পরে তারা খেলায় মেতে ওঠে। সঙ্গী থাকলে ভালো, না থাকলেও একাই খেলা জমে যায়। যেমন— মাছধরা, নৌকা বাওয়া, গুলতি ছোঁড়া ইত্যাদি। অনেক সময় ছোটো শিশুরা পরিবারের মানুষদের অনুকরণ করে আপনমনে নানারকম খেলা নিজেরাই তৈরি করে, যেমন—রান্নাবাটি, বাজার করা, পণ্ডিতমশাই ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ ছোট শিশুর 'পড়া পড়া খেলার' কথা বলেছেন, পণ্ডিতমশাই খেলার আভাস পাওয়া যায় 'শিশু' কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতায়—''আমি আজ কানাই মাস্টার / পোড়ো মোর বেড়াল ছানাটি।"

৩। (খ) **দুইজনের খেলা ঃ** যুদ্ধের জেতা বা হারার বিকল্প যখন খেলায় প্রকাশিত হয়, তখন যুদ্ধ পরিণত হয় শারীরিক কসরতে। কুস্তি, লাঠিখেলা এসব খেলার আনন্দ অনেকেই গ্রহণ করেন। কিন্তু খেলোয়াড় থাকেন মাত্র দুজন। একে অপরের প্রতিপক্ষ। কখনো কোনো উপকরণ ছাড়া খালি হাতে প্রতিযোগিতা চলে, কখনো বা লাঠি, মুগুরের মতো লোকায়ুধকে উপকরণ হিসাবে গ্রহণ করা হয়। এতে একদিকে যেমন প্রতিযোগিতামূলক মনস্তত্ত্ব কিছুটা আশ্বস্ত হয়, অপর দিকে সমাজর যুব সমাজের শরীর চর্চার একটা নিয়মিত ক্ষেত্রও তৈরি হয়।

৩। (গ) **বহুজনের খেলা ঃ** এই ধরনের খেলা আবার দুটি শাখায় বিভক্ত—(i) দলযুক্ত, (ii) দলবিহীন।

৩। গ (i) **দলযুক্ত খেলা** ঃ ইংরাজিতে যাকে বলা হয় Game, বাংলায় তাকে দলযুক্ত খেলা বলা হয়। যেমন—কাবাডি, গাদি, খো খো, এলাডিং বেলাডিং ইত্যাদি। এইসব খেলায় দুটি দলে সমান সংখ্যক খেলোয়াড় থাকে। অনেক সময় দুটি দলের একদিকে একজন বা দুজন, অন্যদিকে বহুজন থাকে। যেমন—কুঁয়ো কুঁয়ো, লুকোচুরি ইত্যাদি।

৩। গ (ii) **দলবিহীন খেলা ঃ** অবসরে বাঙ্গালি ঘুড়ি ওড়ায়, নৌকা বায়, মাছ ধরে, সাঁতার কাটে। এই খেলাগুলি অনেকের অংশগ্রহণে সার্থক হয়ে উঠলেও, এখানে কোনো দল নেই, হার- জিৎ নেই, নিয়মের কাঠিন্য নেই, এখানে আনন্দ করাটাই মুখ্য উদ্দেশ্য। অবসরে অলস জীবন পরিত্যাগ করে শরীরকে, মনকে প্রাণস্পন্দনের গতি দেওয়াতেই এই খেলাগুলির সার্থক।

উপসংহার ঃ নৃতত্ত্ববিদ রেবতীমোহন সরকার বলেছেন, ''শিল্প, সাহিত্য ও সংগীতের মতই ক্রীড়া মানব সমাজ ধারায় একটি অনবদ্য বিষয়....।'' লোকক্রীড়া লোকায়ত মানুষের জীবনচর্যার পরতে পরতে মিশে থাকে। কখনো উৎসবের আচার হিসেবে, কখনো অবসর বিনোদনের মাধ্যমে হিসেবে, কখনো শুধু আনন্দ পাওয়ার জন্য লোকক্রীড়া গুলি তৈরি হয়। যুগ যুগ ধরে লোকসমাজ দ্বারা লোক-ক্রীড়াগুলি গৃহীত, লালিত এবং পরবর্তী প্রজন্মে পরিবাহিত হয়। যুগে যুগে কিছু পরিবর্তন সাধিত হলেও বহু যুগের ওপারের ঝাপসা লোকায়ত জীবনচর্যা ও মানসচর্চার খবর পাওয়া যায় লোকক্রীড়াগুলিতে।

তথ্যপঞ্জি ঃ

১। গ্রন্থ ঃ

চক্রবর্তী, বরুণ কুমার (সম্পাদিত), বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটরস্, ১৯৯২।

বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, আদিবাসী সমাজ ও পালপার্বণ, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতিকেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০১

২। পত্রিকা ঃ

চৌধুরী দুলাল (সম্পাদিত) লোকসংস্কৃতি, লোকক্রীড়া ঃ সমাজতত্ত্ব বিশেষ সংখ্যা, ডিসেম্বর, ২০০২, আকাদেমি অফ ফোকলোর, কলকাতা

সাহু, হরপ্রসাদ (সম্পাদিত), লোককৃতি, সংখ্যা ৪২, অক্টোবর, ২০০১, মহিষাদল, মেদিনীপুর।

৩। ক্ষেত্র সমীক্ষা ঃ

উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার গ্রামগুলিতে ক্ষেত্রসমীক্ষার দ্বারা প্রাপ্ত কিছু তথ্যও প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে কাজে লেগেছে।

With Best Compliments from -

A

Well wisher

প্রলয়

গার্গী দেব

বাড়ির হতদরিদ্র আঙিনার দিকে তাকিয়ে বুকটা হুহু করে ওঠে দুলারির। খড়ের ছাউনি কোনোমতে ঝড়ঝাপটার সঙ্গে যুদ্ধ করে টিকে আছে। ঘর ছাইবে কী করে? ঘরের মরদ যদি অক্ষম হয় আর কী উপায় থাকে? দু'বেলা দু'মুঠো পেটের ভাত জোগাতেই দুলারি বিধ্বস্ত। রেশনের মোটা চাল, মাসের শেষে নুন, লঙ্কা, পেঁয়াজই ভরসা। ডাক্তারবাবু বলেন, সোয়ামিকে ভালো ভালো খাবার দিতে। দুধ, ডিম, মাছ। হা—! দুলারি সে সবের স্বপ্নও দেখতে পারে না। বিশু আজ বছরখানেক ধরে রক্তাল্পতায় ভুগছে।

শেষ বিকালের পড়ন্ত রোদে উঠানের একপাশে বিচালিগুলো গুছোতে গুছোতে দুলারির মনে চিন্তার মেঘ ঘনায়। কাল সকালেই গ্রামের সতীশ মণ্ডল এসে দাম দিয়ে এগুলো নিয়ে যাবে। তবু বিশু দু'দিন কিছুটা দুধ খেতে পারবে। হায় রে কপাল! বুক ঠেলে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। এই দুর্ভাগ্য তো তার হওয়ার কথা ছিল না। সুবোধ ধানবাদ কোলিয়ারিতে চাকরি করতে চলে গেলে বাপ-মা জোর করে এই বিশুর সঙ্গে তার গাঁটছড়া বেঁধে দেয়। সুবোধ কথা দিয়েছিল—'আমার জন্য অপেক্ষা করিস রে দুলারি, ঠিক সময় দুটো পয়সা জমিয়ে তোকে ঘরে লিয়ে যাব।' না, সুবোধের সেই সাধের সিঁদুর সিঁথিতে পরবার সৌভাগ্য তার হয়নি। তার আগেই বিশুর সঙ্গে সম্বন্ধ পাকা করে ফেলেছিল বাপ-মা। হবে নাই-বা কেন? বিশু সুদর্শন, অবস্থা সচ্ছল। দুলারির রূপের আকর্ষণে বিশুই আগ বাড়িয়ে প্রস্তাব নিয়ে আসে। দুলারি একটুও রাজি হয়নি। সুবোধের সঙ্গে সে বিশ্বাস ভাঙতে চায়নি, বাবা-মায়ের পায়ে পড়েছিল, বিয়ের পিঁড়িতে বসতেই চায়নি, কিন্তু শেষে বুড়ো বাপ-মায়ের চোখের জলের কাছে তাকে হার মানতে হয়েছিল। ভাঙা মন নিয়ে সে বিশুর হাত ধরে নতুন সংসার গড়ার স্বপ্ন দেখেছিল। অবশ্য বিশুর তখন এই দুরবস্থা ছিল না। খাওয়া- পরার কোনো কষ্ট ছিল না। জমির ধান, সবজি, গোয়ালে গোরু সবই

ছিল। কিন্তু দু'তিন বছর যেতে না যেতেই সংসারের চাকা অন্যদিকে ঘুরতে শুরু করল। সর্বনাশী কংসাবতীর বাঁধের জল প্রথমে গ্রাস করল তাদের বসতবাড়ি, তারপর জমিটাকে। করাল অভিশাপে সবকিছু হারিয়ে গেল।

উঠোনের একপাশে কাঁঠালতলায় বিচালি টাঁই করতে করতে অস্তমিত সূর্যের বিষণ্ণ ছায়ায় দুলারি কেমন উদাস হয়ে পড়ল। সব স্বপ্ন যেন এক নিমেষে ভয়ংকর দুঃস্বপ্নে পরিণত হলো। পুরুলিয়ার পাহাড় ঘেরা ছোট্ট লালমাটির আশেপাশে ছোট্ট ছোট্ট সাঁওতাল গ্রাম ছবির মতো সুন্দর। হাসি-কান্না-আনন্দের মিশ্র ছন্দে জীবনস্রোত বয়ে চলে সময়ের পরিক্রমায়। সে সুখ সহ্য হয় না ওই সর্বনাশী কংসাবতীর। মাঝে মাঝে অতর্কিতে আসে বিধ্বংসী বান।

—'দুলারি চা করবিক নাই? সাঁঝ নেমে গেল, কাজে তর মন নাই কেন আজ?' দুলারির সম্বিত ফেরে। অসুস্থতার পরে বিশু যেন একটু খিটখিটে হয়ে গেছে। দারিদ্র্য আর অভাবের তাড়নায় জীবনের ছন্দ হারিয়ে যায়।

দুলারির বিয়ের খবর পেয়ে সুবোধ উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে এসেছিল। পুকুরঘাটের নির্জনতায় দুলারির হাত দুটো জড়িয়ে ধরে ব্যথাভরা গলায় শুধু বলেছিল—'দুলারি, তুই বিশ্বাস ভাঙতে পারলি? আমি যে কত স্বপ্ন দেখেছিলাম।' হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দুলারি মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েছিল। —'তোকে কী করে বোঝাব, বিয়া আমি করতে চাইনি রে। বিয়া তো আমি করি নাই, বাপ-মা দেছেন।' —'বেশ, তবে তুই আমার সঙ্গে এখনই চল। আমরা ঘর বাঁধি।' দুলারির মুখে আঁধার ঘনায়, 'উটি করতে লারব, নাগর। সোয়ামির ঘর ভাঙতে লারব।' —'তবে তুই আমার সঙ্গে বেইমানি করলি কেনে, বল?' সুবোধ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। —'মিছা কথা বলি নাই। তুকে ভালবেসেছিলাম বটে, কিন্তু ও তো সেদিনের কথা। আমার সোয়ামির ইজ্জত এখন আমাকে রাখতেই হবে। 'উকে ছাইড়া কুথাও যাইতে লারব।' —'ঠিক আছে দুলারি। তবে এই বেইমানির ফল ভালো হবে নাই এই তুকে বলে রাখলাম।' কাঠচাঁপার গাছটার পিছন দিয়ে সুবোধ দ্রুতবেগে অদৃশ্য হয়ে যায়।

'কার সঙ্গে কথা বলছিলি রে দুলারি? তর সেই পুরাতন লাগর নয়?' বিশু কখন না জানি ঘরের দাওয়ায় এসে দাঁড়িয়েছিল। বিরক্ত হয় দুলারি। অসুস্থ শরীরে সন্দেহবাতিক যায় নাই মানুষটার। কাঁখের পিতলের ঘড়াটা ঘরের কোণে বসিয়ে রেখে উত্তর দেয়, —'হ্যাঁ, সে-ই বটে, ক্যানে তর জ্বলন হচ্ছে বুঝি?'

সুবোধ কোলিয়ারির চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে এখন এই পলাশতলিতেই থাকে, হয়তো দুলারির আকর্ষণেই। মাঝে মাঝে তো অন্তত চোখের দেখা হবে।

দুলারির মনে একটুও শান্তি নেই। জীবনের পরম সম্পদ যে হারায়, কোন্ আনন্দের খোঁজ সে পাবে? সুবোধই কি পেয়েছে? তবু বিশুকে দুলারি ছাড়তে পারবে না কিছুতেই। শাঁখা-সিঁদুরের শপথ ভুলে সে সুবোধের হাত ধরবে কী করে? না, এ তার পক্ষে আজ সম্ভব নয়, তার চেয়ে এই ভালো বাপের দেওয়া ছোট দু'কাঠা জমিতে ধান বোনা, সবজি ফলানো আর আধপেটা খেয়ে রুগ্ন স্বামীর পরিচর্যা। ওর মতো অভাগি আর কে আছে? সুবোধ আজ অতীত, বিশুকে নিয়েই তাকে বাঁচতে হবে। তাছাড়া ওর শরীরের মধ্যে যে আরেকটা প্রাণ ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে তাকে সে অস্বীকার করবে কীভাবে? পোয়াতি শরীরটার একটু ভালো খাবার দরকার। গ্রামের মেয়ে-বউরা ওকে ভালোবেসে পাকাপেঁপে, পেয়ারা, কলা, এটা-সেটা খেতে দেয়।

ঘরে ঘরে কানাঘুষো, মহাঝড় আসছে ধেয়ে, ভীষণ বেগে। সরকারি উদ্যোগ চলছে পুরোদমে। সমাজসেবী সংস্থাগুলো মানুষজনকে নদীর ধার থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। স্কুলবাড়িতে সব ব্যবস্থা হয়েছে।

সেদিন সকাল থেকেই অঝোরে বৃষ্টি হয়ে চলেছে। ঘন কালো আকাশটা যেন জলধারা আর ধরে রাখতে পারছে না। তার সঙ্গে প্রতিনিয়ত দমকা ঝোড়ো বাতাস। বড়ো বড়ো গাছগুলো ঝড়ের সঙ্গে যেন আর যুঝতে পারছে না। ভেঙে পড়ছে ফলন্ত ডালগুলো। প্রকৃতি যেন ধ্বংসলীলায় মত্ত। নানা চিন্তায় দুলারির মনও আঁধার। গোয়ালের গোরুটাকে দড়ি ধরে টানতে টানতে এগিয়ে যায় স্কুলবাড়ির দিকে। বৃষ্টির দাপট ক্রমশই বাড়ছে, সেই সঙ্গে ঝড়ের তাণ্ডব। আসন্ন দুর্যোগের ইঙ্গিত পেয়ে ভীত গোরুটা তারস্বরে ডাকতে থাকে। দুলারি ব্যাকুল হয়ে ওঠে। হাতে সময় বেশি নেই। কোনোরকমে দড়িটা শক্ত করে আঙিনায় পেয়ারা গাছের গোড়ায় বাঁধে।

'হুঁশিয়ার ভাইসকল, বাঁধ ভেঙে কংসাবতীর তীব্র স্রোত ধেয়ে আসছে। পালাও সবাই।' বাঁধের টাওয়ারে লালবাতির বিপদ সংকেত। মুহূর্তে যেন দৃশ্যপটের এক দ্রুত পরিবর্তন। চারিদিকে শুধু প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে উদ্‌ভ্রান্ত মানুষের আর্তনাদ। বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দে কিছু শোনা যায় না। মাইকে সরকারি ঘোষণা ক্রমশ ফিকে হয়ে আসে। দুলারির চোখে ভেসে ওঠে বিশুর রোগজীর্ণ শীর্ণ মুখটা। ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষটা বুঝি ব্যাকুল হয়ে তার নাম ধরেই ডেকে চলেছে। দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দুলারি ছোটে ছোট্ট দরমার কুঁড়েটার দিকে। কংসাবতীর ঘোলা জল এখন রাক্ষসীর মতো সর্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে ছুটে আসছে তার অস্থির বুভুক্ষা মেটাতে। —'কোথা যাস, দুলারি?' সুবোধ পথ আটকে দাঁড়ায়। দুলারির হাত দুটো সবল দুই মুঠোয় চেপে ধরে বলে—'তোকে আমি ফিরতে দেব না দুলারি। এভাবে তোকে মরতে দেব না।' —'হাত ছাড় বলছি, সুবো, হাতে আর একটুও সময় নেই।' এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটতে থাকে দুলারি। পিছন পিছন সুবোধ। হাঁফাতে হাঁফাতে দুলারি খাটিয়া থেকে বিশুকে বুকে তুলে নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ায়, আর ঠিক সেই সময় বাঁধভাঙা জলের পর্বতপ্রমাণ ঢেউ আছড়ে পড়ল কুঁড়েটার উপর। টাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল দুলারি। এক মুহূর্ত মাত্র। সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করল সে। 'দুলারি!' এক মর্মভেদী আর্তনাদ। এক হাতে স্বামীকে জড়িয়ে ধরে বাঁ হাত তুলে স্রোতের সঙ্গে যুঝতে পারল না দুলারি। সুবোধের চোখের সামনে নিমেষে অতল জলে তীব্র স্রোতে ভেসে গেল তার শরীরটা। 'দুলারি!' সুবোধের মর্মভেদী আর্তনাদ ঝোড়ো বাতাসে দূরে মিলিয়ে গেল। □

জাতীয় পতাকায় ‘শ্রীমধুসূদন’ দুশো বছরেও অম্লান, হীরকখচিত সমুজ্জ্বল

স্বপনকুমার মণ্ডল

মধুসূদন দত্তের (১৮২৪- ১৮৭৩) মৃত্যুর পর ‘বঙ্গদর্শন’ (ভাদ্র ১২৮০) পত্রিকায় কবির প্রশংসায় পঞ্চমুখ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সুপবন বইতে দেখে জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দিয়ে তাতে লিখতে বলেছেন ‘শ্রীমধুসূদন’। উনিশ শতকের নবজাগরণের প্রভাবে প্রস্ফুটিত বাংলা সাহিত্যের পরিচয়ে সাহিত্যসম্রাট সেদিন যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন। বাংলা সাহিত্য যে ইতিপূর্বে উৎকর্ষমুখর বনেদিয়ানা লাভ করেছে, বঙ্কিমচন্দ্রের মনে তা নিয়ে কোনোরকম সন্দেহ ছিল না বলেই তাঁর এরূপ মনোভাব স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বেরিয়ে

এসেছে। সেখানে কবি জয়দেবের পরেই মধুসূদন দত্তের নাম করেছেন সাহিত্যসম্রাট। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক যোগসূত্র রক্ষা করে মধুকবির অসাধারণ বিস্তার আরও বেশি মহিমান্বিত করেছে বাঙ্গালিকে। আসলে বাঙ্গলার ঐতিহ্য সুপ্রাচীন হলেও বাঙ্গালির মননের নির্বিরোধ চলন খুব বেশি দিনের কথা নয়। সাহিত্যকে সেই মননের চলনে প্রতীয়মান করলেই বিষয়টি সহজবোধ্য হয়ে ওঠে। চর্যার সূচনায় ‘চঞ্চল চীএ’-র কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। অথচ সেই চঞ্চল চিত্তটি ধর্মীয় বিত্তে বৃত্তাকারেই আবর্তিত থেকেছে সুদীর্ঘকাল। সেখানে শুধু বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনযুগেরই নয়, তার মধ্যযুগের বহুমুখী সাহিত্যশাখাতেও সেই চঞ্চলা প্রকৃতির সবুজ বাতায়নে সুদূরের পিয়াসীর হাতছানি উপেক্ষিত হয়েছে। আসলে যেখানে চিত্তরঞ্জন ও চিত্তপ্রসাদের আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হয়ে ওঠে না, যেখানে চিত্তকে জয় করার মধ্যে জীবনধারণের বার্তাই প্রকট হয়ে ওঠে, সেখানে চিত্তের ব্যক্তিকেন্দ্রিক সঙ্কীর্ণতাবোধ কাটিয়ে ওঠা দুরূহ। এজন্য দেবনির্ভর প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সমাজ বা গোষ্ঠীগত চেতনার মধ্যে ক্রমশ ব্যক্তিজীবনের অস্তিত্ব নানাভাবে পরিব্যাপ্ত হলেও তাতে জীবনতৃষ্ণা মূর্ত হয়ে ওঠার অবকাশ পায়নি। সেখানে নিয়তিতাড়িত জীবনকে কেন্দ্র করেই তা আবর্তিত। শুধু তাই নয়, যেখানে মানবিক আবেদন (‘সবার উপর মানুষ সত্য’) বিঘোষিত হওয়ার অপেক্ষায় তৃষ্ণাতুর, সেখানে ‘আমি সত্য’র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ আপনাতেই ব্রাত্য হয়ে পড়ে। জীবন বাঁচানোই যেখানে উপজীব্য হয়ে ওঠে, সেখানে তার চিত্তের সম্প্রসারণ অপ্রত্যাশিত মনে হয়। জীবনরসিক কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীও সেখানে প্রতিকূল জীবনচিত্রের পাশে চিত্তজয়ী প্রকৃতিকে সবুজ করে তুলতে পারেননি। অন্যদিকে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার সোপানবাহী তথা মধ্যযুগের আধুনিক মননশীল কবি ভারতচন্দ্র ‘যাবনী মিশাল’ দিয়েও চিত্তের প্রসার ঘটাতে পারেননি। সেখানে জীবনের পরিচয় মূর্ত হয়ে উঠলেও তার চিত্রশীলতা যাপনপ্রকৃতির মধ্যেই আবর্তিত। আসলে জীবন মানে তো শুধু প্রাণে বাঁচা নয়, তার সমৃদ্ধি লাভ করে মনে আর মানের উৎকর্ষে। সেই মানের উচ্চতা এবং মনের প্রসারতা বাঙ্গালিজীবনে তখনও অধরামাধুরী। শুধু

তাই নয়, বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতার সূচনাতেও তার আবেদন মূর্ত হতে পারেনি। এজন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে মধুসূদন দত্তের জন্য। মধুকরের মতো তিনি দেশে-বিদেশের মধু সঞ্চয় করে বাংলা সাহিত্যে প্রথম আন্তর্জাতিক আস্বাদ বয়ে আনেন। শুধু তাই নয়, তাঁর সচেতন প্রয়াসেই তা সম্ভব হয়েছে। সেদিক থেকে তাঁর 'মাইকেল' হওয়াটা তাঁকে বাঙ্গালিসমাজে ব্রাত্য করে তুললেও বাংলা সাহিত্যের বুনিয়াদকে যে বনেদি করে তুলেছে, তা তাঁর এক 'মেঘনাদবধ কাব্যে'ই (১৮৬১, ১৮৬২) প্রতীয়মান। অন্যদিকে উনিশ শতকে কলকাতাকেন্দ্রিক নবজাগরণের মাধ্যমে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সোপানে সেই চিত্তের প্রসারণ সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এজন্য অবশ্য বাঙ্গালি মননের সক্রিয়তার অভাবকে সম্পূর্ণ দায়ী করা চলে না। কেননা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই যে বাংলা সাহিত্যের অভিমুখ সম্পূর্ণত আন্তর্জাতিক হয়ে উঠল, তাও না। বিষয়টি সেদিক থেকে বিশ্লেষণের দাবি জানায়।

বাঙ্গালির বিত্তের অভাব থাকলেও চিত্তে সে শুধু বনেদি নয়, অভিজাতও বটে। চিত্তশালী বাঙ্গালি তার স্বভাবে বিত্তের দাস হওয়ার বাতিককে অত্যন্ত সহজেই পরিহার করতে পেরেছে। শুধু তাই নয়, তার ঘরকুনো প্রকৃতির মধ্যেও ভাববিলাসী চিত্তটির আশুতোষ প্রকৃতিটি অত্যন্ত সতেজ ও সজীব ছিল। আধুনিক পরিসরেও অনুকরণপ্রিয় বাঙ্গালির মধ্যে পাশ্চাত্য বণিকদের ব্যবসাবৃত্তিকে আত্মস্থ করার সদিচ্ছা সক্রিয় হয়ে ওঠেনি। অন্যদিকে চাঁদবেনে কিংবা ধনপতির বাণিজ্যযাত্রাও নিস্তরঙ্গ বাঙ্গালিজীবনে সেভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। সেক্ষেত্রে ধনের প্রাচুর্য বৃদ্ধিতে আধিপত্য বিস্তারের প্রতি বাঙ্গালিমানস চিরকালই উদাসীন থেকেছে। অথচ মননচর্চায় ও মননের মধু আহরণে স্বভাবজয়ী বাঙ্গালির চিত্তের গতিশীল অভিমুখ অনায়াসেই আধুনিকতার পরশকে আত্মস্থ করায় উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। শুধু তাই নয়, সেখানে বণিক হওয়ার বাসনা তীব্র না হলেও সাহেব হওয়ার কল্পনা নিবিড়তা লাভ করেছে। সেক্ষেত্রে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির আলোয় বাঙ্গালিচিত্তের প্রসারণ ঘটেছিল অতি দ্রুততায়। সাহিত্যে তার প্রতিফলন ঘটতে সময় লেগেছে ঠিকই, কিন্তু তাতেও তার চিত্তের স্বকীয়তা প্রতীয়মান। আসলে বাঙ্গালির স্বকীয়তায় তার মননের আভিজাত্যবোধ অত্যন্ত প্রকট ও স্বভাবজাত। এজন্য তার স্বাজাত্যবোধ ও স্বদেশপ্রীতিজাত ভাষিক অস্তিত্ব কখনই তাকে হীনম্মন্যতাবোধে ব্রাত্য করে তোলেনি কিংবা ভাষান্তরে বিপথে চালিত করেনি। শুধু তাই নয়, বাঙ্গালি তার স্বভাবসিদ্ধ মননের প্রতি বরাবরই শ্রদ্ধাশীল থেকেছে। এজন্য চিত্তের প্রসারণে যেমন ডানা মেলে দিতেও তার দ্বিধাবোধ হয়নি, তেমনই তার সংকোচনেও জড়তা জেগে ওঠেনি। সেখানে বাঙ্গালিত্বের গরিমা আপনাতেই ভাস্বর। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মধ্যেই তা প্রতিভাত ও প্রতিপন্ন। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর গুরু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মধ্যেই খাঁটি বাঙ্গালি কবির পরিচয়ের কথা সপ্রশংস ব্যক্ত করেছেন। আবার তাঁর প্রয়োজনও ফুরিয়েছে বলে তাঁর অভিমত। অন্যদিকে আধুনিক শিক্ষার সোপানে গড়ে তোলা আধুনিক মননের সক্রিয়তার অবকাশে যেখানে রক্ষণশীলতা বনাম প্রগতিশীলতার দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে ওঠে, সেখানে চিত্তের পক্ষবিস্তার সীমাবদ্ধ মনে হয়। আসলে স্বদেশের ভাবনাই যখন দানা বাঁধে না, সেখানে দেশান্তরের চেতনা আপনাতেই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। অথচ তারপরেও বাঙ্গালিচিত্ত দেশান্তরের অভিমুখে অভিযান করেছে। রাজা রামমোহন রায় সেই অভিযাত্রী। ফরাসি বিপ্লবের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার পতাকা তাঁকে শ্রদ্ধান্বিত করেছিল। অথচ বহু ভাষাবিদ হয়েও তাঁর পক্ষে সাহিত্যে আন্তর্জাতিকতার আবহ বয়ে আনার অবকাশ ছিল না। সেই অবকাশে মধুসূদন দত্তই বাংলা সাহিত্যে আন্তর্জাতিকতার আবহই শুধু বয়ে আনেননি, তার ভিতেই তাঁর সৃষ্টিকৌশল নবদিগন্তের সূচনা করেছে। সেখানে তাঁর সনেট, অমিত্রাক্ষর ছন্দ থেকে গীতিকবিতার সোপানই শুধু প্রস্তুত হয়নি, আন্তর্জাতিক আকুতি থেকে তার চেতনার আলোও বিস্তার লাভ করেছে। উনিশ শতকীয় নবজাগরণের আলোয় বাংলা সাহিত্যের আকাশে আধুনিকতার বর্ণরঙিন পরিসরটি অত্যন্ত সচেতনভাবেই গড়ে তোলায় ব্রতী হয়েছিলেন মধুসূদন। সেখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মেলবন্ধনে তাঁর ভূমিকাটি শুধু পথিকৃতের আভিজাত্যে নিঃস্ব হয়ে পড়ে না, বরং উৎকর্ষবিধায়ক আলোকিত পরিসরে নবচেতনার দ্বার উন্মুক্ত করে তোলে। সেক্ষেত্রে মধুসূদন শুধু পাশ্চাত্য ভাবনায় ভাবিত হয়ে শুধুমাত্র তাঁর বিষয়গৌরবেই গৌরবান্বিত হতে চাননি, তার আঙ্গিকসৌষ্ঠবেও বনেদি হতে চেয়েছিলেন। সেখানে পাশ্চাত্য ভাষা শিক্ষাতেও তাঁর অদম্য প্রয়াস বিস্ময়কর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মধুসূদনই প্রথম বাংলায় গ্রিক ভাষাচর্চা করেছিলেন।

তাঁর 'পদ্মাবতী' (১৮৬০) নাটকে যেমন প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেছেন, তেমনই তাতে গ্রিকপুরাণের কাহিনি অবলম্বিত হয়েছে। আর তাঁর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অপূর্ব সমন্বয়ে প্রস্তুত 'মেঘনাদবধ কাব্য'টিতে সেই গ্রিকপুরাণের হাতছানির নিবিড়তার কথা তিনি রাজনারায়ণ বসুকে অকপটে জানিয়েছেন ঃ 'It is my ambition to engraft the exquisite graces of the Greek mythology on our own; in the present poem, I mean to give free scope to my inventing power (such as they) and to borrow as little as I can from Valmiki.' শুধু তাই নয়, সেক্ষেত্রে মধুসূদন গ্রিক কাহিনির চেয়ে গ্রিকের মতো লিখতে চেয়েছিলেন, 'I shall not borrow Greek stories but write, rather try to

write, as a Greek would have done.' মধুসূদনের সদম্ভ প্রকৃতির মধ্যে যেমন তাঁর সহজাত প্রতিভার চারিত্রিক বিশেষত্ব বর্তমান, তেমনই তাতে আন্তর্জাতিক মননের উৎকর্ষও বিদ্যমান। অন্যদিকে মননের স্বকীয় আভিজাত্যে মধুসূদনের স্বাধীন প্রকৃতির সবুজ বাতায়নই তাঁকে প্রগিতিশীল পাশ্চাত্য মানসপ্রকৃতির আধুনিকতাবোধে সক্রিয় করেছিল। সেখানে তাঁর আদর্শ কবি মিল্টনের 'Paradise Lost'-এর শয়তানের স্বাধীনতাবোধও তাঁর মাধ্যমে উচ্চকিত হয়েছে। 'Better to reign in hell than to serve in heaven' এর প্রতিধ্বনি মধুসূদন তাঁর সেই কাব্যে কত ভাবেই না ব্যক্ত করেছেন। স্বধর্মে নিধনও শ্রেয়, পরধর্ম ভয়াবহ'র বার্তা তাঁর প্রিয় নায়ক মেঘনাদের মাধ্যমে নানাভাবে উচ্চারিত হয়েছে। রাবণের সংসর্গ ছেড়ে 'রামের পদাশ্রয়ী' তথা 'ধর্মপথগামী' রাবণ-অনুজ বিভীষণের প্রতি মেঘনাদের তীব্র ভৎর্সনা ধ্বনিত হয়েছে, 'শাস্ত্রে বলে, গুণবান যদি / পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি / নির্গুণ স্বজন শ্রেয়, পরঃ পরঃ সদা!' সেখানে বাল্মীকি রামায়ণের উক্তি মেঘনাদের কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হলেও তার মধ্যে মিল্টনীয় উচ্চারণ প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে। আন্তর্জাতিকতা যেমন উদারতার হাতছানি বয়ে আনে, তেমনই আত্মসম্মানবোধকেও সক্রিয় করে। কেননা পারস্পরিক সম্মানবোধের মাধ্যমেই আন্তর্জাতিক পরিসরটি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এজন্য নিজেদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাবোধ শুধুমাত্র শ্রেষ্ঠত্বের সোপান প্রস্তুতেই সহায়ক হয়ে ওঠে না, সেইসঙ্গে মানবিক দায়বদ্ধতায় উদার আকাশের হাতছানিও বয়ে আনে। সেদিক থেকে 'বিধর্মী' মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে স্বাজাত্যাবোধের মাধ্যমে স্বধর্মের আদর্শে প্রাণিত করতে চেয়েছিলেন, তা শুধু তাঁর স্বকীয় প্রকৃতিকেই আভিজাত্য প্রদান করে না, সেইসঙ্গে অন্তর্জাতবোধকেও সক্রিয় করে তোলে। সেখানে দেব-দৈত্য থেকে প্রভু-দাসের আপাতিক সমীকরণটিই রূপান্তরিত হয়ে মানবিক অস্তিত্বে উৎকর্ষমুখর মনে হয়। তাতে অস্তিত্বের সোপান বেয়ে মননবিশ্বে আত্মসচেতনতার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আবেদনটিও মূর্ত হয়ে ওঠে। শ্রেষ্ঠত্ববোধে মূল্যবোধ সেখানে গতি লাভ করে। আর সেই গতি বাংলা সাহিত্যের প্রগতিকে ত্বরান্বিত করেছে।

অন্যদিকে বাঙ্গালি ধনে ধনী না হলেও মনে বনেদি। সেক্ষেত্রে সাহিত্যে তার স্ববাক্‌মূর্তিটিকে প্রতিমায় রূপান্তর করে শ্রদ্ধা নিবেদন করাটা ছিল সময়ের অপেক্ষামাত্র। অথচ তার জন্য প্রয়োজন তা আত্মস্থ করা। মধুসূদন তা পেরেছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে আন্তর্জাতিক মননের সংযোগটি রক্ষা করা সহজসাধ্য হয়েছিল। শুধু তাই নয়, তিনি অত্যন্ত সচেতনভাবেই আন্তর্জাতিক পরিসরটিকে বাংলায় আপন করে যাপন করেছেন। অন্যদিকে সে সময় বাঙ্গালিমানসে শিক্ষা-সংস্কৃতির আলো প্রতিফলিত হলেও তার মননের অভিমুখটি ছিল তখনও স্বদেশি। স্বাভাবিকভাবেই আন্তর্জাতিক মননকে আত্মস্থ করার শক্তি ও প্রতিভা এবং সদিচ্ছার অভাবে অনেকেই মধুসূদনের মতো সফলকাম হতে পারেননি। অন্যদিকে বাঙ্গালির স্বকীয়তায় চিত্তের প্রসারণ ঘটলেও তার আভিজাত্যবোধে তা আপনার স্বরচিত বৃত্তে আবর্তিত হয়েছে। মধুসূদন পোশাকে সাহেব হলেও মনে প্রাণে আজীবন বাঙ্গালিই ছিলেন। মনের এই স্বকীয়তা বাঙ্গালির সহজাত। বঙ্কিমচন্দ্রও মননে আন্তর্জাতিক হয়েছিলেন। অথচ তিনি আবার তাঁর স্বরচিত বৃত্তেই ফিরে এসেছেন। শিল্পী বঙ্কিমের চেয়ে সেখানে নীতিবাগীশ বঙ্কিমের পরিচয় প্রকট হয়ে উঠেছে। আসলে এঁরা আন্তর্জাতিক ছাঁচটিকে ব্যবহার করেছেন মাত্র, অনুকরণ বা অনুসরণের নকলনবিশি করেননি। তার অন্তস্থিত সত্তাটিকে সাজিয়েছেন নিজের মতো। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ তো দেশীয় সত্তার মধ্যে আন্তর্জাতিক পরিসরকে মিলিয়ে দিয়েছেন। 'হে মোর চিত্ত'-এর 'দিবে আর নিবে মেলাবে মিলিবে'র আহ্বানে কবিগুরু বাঙ্গালিচিত্তের অসীম বিস্তারকে অমোঘ করে তোলেন। তাঁর 'নব মহাভারত' (প্রমথনাথ বিশী রবীন্দ্রসাহিত্যকে এভাবে অভিহিত করেছেন) সাহিত্যে আবিশ্ব প্রতিধ্বনিত হয়েছে। অন্যদিকে এজন্য তাঁকে আন্তর্জাতিক মুখাপেক্ষী হতে হয়নি। অথচ তাঁকে বিরোধিতার নামান্তরে বিশ শতকের তৃতীয় দশকে বিদেশি সাহিত্যের অভিমুখে কল্লোলীয় অভিজাত্রায় বাংলা সাহিত্যে আন্তর্জাতিক পরিসর উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রবীন্দ্রনাথই বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় আন্তর্জাতিক পরিসরকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। কল্লোলীয় সাহিত্যের অভিমুখ আন্তর্জাতিক হলেও তার আবেদন কতখানি আন্তর্জাতিকতা সম্পন্ন হয়ে উঠেছে, তা নিয়ে বিতর্ক বর্তমান। তবে বাংলা সাহিত্যের অভিমুখটি যে কল্লোলীয়দের মাধ্যমে আন্তর্জাতিকতায় শামিল হয়েছে, তা অনস্বীকার্য। অন্যদিকে যা মধুসূদনে প্রতিফলিত হয়েছে, তাই রবীন্দ্রনাথে অভ্যন্তরীণ পূর্ণপ্রতিফলন ঘটেছে। সেদিক থেকে কল্লোলীয় সাহিত্যে সেই আন্তর্জাতিক মননটি তার অভিমুখের সামনে অবিকল্প হয়ে ওঠে। কেননা সেখানে 'পথ রুধি' রবীন্দ্র ঠাকুর। স্বাভাবিকভাবেই আন্তর্জাতিক আবহে বাংলা সাহিত্য তাতে নতুন মাত্রা লাভ করে। দেশ থেকে দেশান্তরে তার অভিযাত্রা, সীমা থেকে অসীমে তার হাতছানি। সেখানে মধুসূদনের কবিকণ্ঠই যে সেই যাত্রার আগমনিকে সূচিত করেছিল, তাও সহজে অনুমেয়। এবছর তাঁর জন্মের দুশো বছর পূর্তিতে সেই আন্তর্জাতিক কবিকণ্ঠই আমাদের হাতছানি দিয়ে চলেছে। মধুসূদন দত্তকে নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সুগভীর প্রত্যয় আজও সমান প্রাসঙ্গিক, ভাবা যায়!

রাত্রির কান্না

ড. রাকেশ দাশ

সেই যে সেই বছর এক বড়ো ঝড় হলো। নাম রেখেছিল আয়লা। তছনছ হয়ে গেল সব। দিন দুপুরে চারিদিক অন্ধকার করে উঠল প্রবল ঝড়। বাড়ি ভাঙল, বাঁধ ভাঙল, জল ঢুকল, কত লোক ভেসে গেল। গোরু, বাছুর ভেসে গেল। পাড়ার কুকুরগুলো গেল মরে। প্রায় এক সপ্তাহ সেই সব পশুপাখির মৃতদেহ ভাসতে থাকল জলে। ফুলে ঢোল হয়ে ভাসতে থাকল। নোনা জল ঢুকে জমি গেল মরে।

বহুদিন শহুরে বাবুরা এসে খাবার, জল, কাপড় দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল মিনতিদের গ্রামের প্রায় দেড়শোটা পরিবারকে। মিনতি পরে জেনেছিল যে, ওদের মতো ঝড়ে সর্বস্ব খোয়ানো মানুষগুলিকে খাওয়ানোর জন্য যে জল, খাবার, কাপড় শহর থেকে এসেছিল— তার অনেকখানি নাকি বুলাঙ্গির গিলে ফেলেছিল।

হাভাতে বুলাঙ্গির। পাড়ার কয়েকটা বখাটে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামের প্রান্তে বসে মদ গাঁজা খেত। তার পরে কেমন করে যেন কোনো এক নেতা মানুষের হাত ধরে হেমগঞ্জের বাজার থেকে চাঁদা তোলা শুরু করল। মিনতির বরের একটা ছোট্ট দোকান ছিল হেমগঞ্জের বাজারে। মনোহারি দোকান। কলকাতা থেকে সিঁদুর, আলতা, কাঁচ-প্লাস্টিকের চুড়ি, ইমিটেশনের গয়না, পাউডার, সেন্ট, সাবান, শ্যাম্পু এনে বিক্রি করত মিনতির বর চন্দন।

মাত্র উনিশে পড়তে না পড়তেই বিয়ে হয়েছিল মিনতির। চন্দনের তখন একুশ। চন্দনের মা বেঁচেছিল তখন। ক্যানসার হয়েছিল চন্দনের মায়ের। মরার আগে নাতির মুখ দেখতে চেয়েছিল। সেজন্য তড়িঘড়ি বিয়ে। কিন্তু ইচ্ছা পূরণ হয়নি তার। মিনতি যখন ৫ মাসের পোয়াতি তখন তার শাশুড়ি চলে গেল না ফেরার দেশে। চন্দন খুব কেঁদেছিল সেদিন। গ্রামশুদ্ধ লোকের সামনে মিনতিকে জড়িয়ে ধরে শিশুর

মতো কেঁদেছিল। প্রায় দিন রাতে যে পুরুষটির বলিষ্ঠ বাহুর আলিঙ্গন আর ঘামের গন্ধ মিনতির নারীসুলভ উদগ্র কামনাকে জাগিয়ে তুলত, সেই পুরুষটিই সেই দিন মিনতির হৃদয়ে হঠাৎ বাঁধভাঙা বাৎসল্যের স্রোত বইয়ে দিয়েছিল। নিজের গর্ভে থাকা অদেখা প্রাণটিকে সেদিন সেই পূর্ণযৌবন পুরুষটির থেকে আলাদা করতে পারেনি মিনতি। চোখের জলে ভাসতে ভাসতে পরম মমতায় চন্দনের কোঁকড়া চুলে বিলি কেটে সান্ত্বনা দিয়েছিল তাকে।

কয়েক মাস পরে মিনতির মেয়ে হলো। ফুটফুটে মেয়ে। মিনতির মতোই শ্যামলবরণ মেয়ে। চন্দনের গায়ের রং কিন্তু ফরসা। গ্রীষ্মের জ্যোৎস্না ধোওয়া পূর্ণিমার রাতে সেদিন মৃদুমন্দ হাওয়া আসছিল নদীর দিক থেকে। বেড়ার ঘরের ফোকর দিয়ে পাঁকমাটি আর বেলিফুলের মিশ্রিত গন্ধ নিয়ে জ্যোৎস্নায় মাখামাখি হয়ে ঢুকছিল চাঁদের আলো। ছোট্ট তক্তপোশের উপর চন্দন আর মিনতির মাঝে শুয়েছিল রজনী—চন্দন আর মিনতির মেয়ে। মিনতি তখন মেয়েকে দুধ খাওয়াচ্ছে। চন্দন নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়েছিল মেয়ের দিকে। মিনতি বলেছিল, ''অমন করে তাকিয়ে থাকো কেন? লাজ লাগে না আমার?'' দুষ্টুমির হাসিতে ভরে উঠেছিল চন্দনের মুখ। সেই হাসিতে ম্লান হয়ে গিয়েছিল বড়ো গোল চাঁদের আলোটুকুও। চন্দন বলেছিল, ''লাজ লাগে বুঝি?'' মিনতির কালো মুখের লজ্জার লালিমা ফুটে উঠেছিল স্পষ্ট। প্রসঙ্গ ঘোরাতেই বলেছিল, ''কেন? তুমি কী ফরসা? তোমাকে কি আমি ফরসা দেখে ভালোবেসেছি?'' মিনতি আর কিছু বলেনি। ঘুমন্ত মেয়েকে পাশে সরিয়ে ঘন হয়ে এসেছিল চন্দনের দিকে। চন্দনের হাতখানা টেনে কঠিন বাহুর উপর মাথা রেখে তার বুকে মুখ গুঁজে দিয়েছিল।

মিনতির মেয়ে রজনী বড়ো হতে লাগল। দিনকাল বদলাল। একদিন ঝড় উঠল। বাড়ি ভাঙল, মিনতির পোষা ছাগলগুলো মরল। বহু দিন অন্যের দয়ায় জীবন বাঁচল মিনতিদের। সামান্য একফালি জমিতে যেটুকু চাষ হত সেটাও বন্ধ হলো। নোনা জলে নষ্ট হলো মাটি। চন্দনের দোকানের আয়ে ঘর চালানো মুশকিল হলো। মিনতিকেও কাজে লাগতে হলো। নদীর নোনা জলে বুক পর্যন্ত ডুবে কাঠি ধরা শিখল মিনতি। মিনতি জানে, কাঠি যখন বড় হয়ে বাগদা হয় তখন তার অনেক দাম। কিন্তু, কাঠির দাম তত নয়। তবু কিছু তো উপার্জন বাড়ত পরিবারের। চাষ তো বন্ধ। এতদিনের সংসারে এত ঝড় ঝাপটার মধ্যেও চন্দনের সঙ্গে মিনতির কোনদিন ঝগড়া হয়নি। গ্রামের দশটা জোয়ানমদ্দ ছেলের থেকে চন্দন একটু আলাদা। সে মদ খায় না। মাঝেমধ্যে বিড়ি খায়। তাও বাড়িতে নয়। দোকানে বা দোকান থেকে ফেরার পথে বিড়ি খেয়ে আসে সে। গন্ধে টের পায় মিনতি। চন্দনের সঙ্গে ঝগড়া করার মতো কোনো কারণ পায় না মিনতি। শুধু যখন মেয়েকে নিয়ে পুকুর ঘাটে হুটোপুটি করে জল ঘাঁটে চন্দন, তখন তার রাগ হয় চন্দনের উপর। চন্দন কি ছোট্ট ছেলেটি নাকি? কিন্তু যেই না মিনতি তার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় দুই কথা শুনিয়ে দেওয়ার জন্য, তখনই চন্দনের সেই দিনের মুখটা মনে পড়ে যেত—যেদিন মায়ের শোকে ছোট্ট শিশুর মতো মিনতিকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিল চন্দন। মিনতির রাগ গলে জল হয়ে যেত। ভারী শান্তির জীবন তার।

কিন্তু, সেই শান্তির নীড়ে একদিন আবার নতুন করে ঝড় উঠল। বর্ষার রাত। সন্ধ্যা থেকে বৃষ্টি পড়েছে অনেক। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে বৃষ্টির তোড়। শেষ খেয়া এসে লেগেছে ঘাটে। কিন্তু চন্দন ফেরেনি। মিনতির ভারী ভয় করছে। কোথায় চন্দন? অত রাতে অত বৃষ্টি মাথায় করে ছোট্ট রজনীকে ঘরে রেখে বেরোনোর সাহস পায়নি মিনতি। সারারাত চোখের পাতা এক করতে পারেনি সে। ঠাকুরকে ডেকেছে বিছানায় শুয়ে। পরের দিন সকালে বৃষ্টি থেমেছে। মিনতি ছুটে গেছে ঘাটে। থমথমে মুখে মাঝি বলেছে, ''তুমি একবার বাজার পানে চল বউদি। কাল রাতে বৃষ্টিতে আর তোমাকে খবর দিতে পারিনি। চন্দনের শরীরটা ভালো নয়। হাসপাতালে ভর্তি।''

বুকের রক্ত জমাট বেঁধেছে মিনতির। কী হয়েছে চন্দনের? প্রশ্ন করলেও উত্তর দেয়নি মাঝি। উত্তর দেয়নি নৌকার নিত্যযাত্রীদের কেউই। মিনতিকে বিনা পয়সায় পার করে দিয়েছে কেবল। ওপারে নামিয়ে বলেছে, ''ওখান থেকে গাড়ি ধরে হাসপাতালে যাও। সেখানেই হাসপাতালের ডাক্তারবাবু সব বলে দেবে তোমাকে।'' দমাদম হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে মিনতির হৃৎপিণ্ডে। ভয়ে পাণ্ডুর মুখ নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছে দেখতে পেয়েছে চন্দনকে। সারা গায়ে কালশিটে। মাথায় সাদা পট্টির উপর রক্তের দাগ। শক্ত বাহুতে ধারাল অস্ত্রের কোপের চিহ্ন।

অবস্থা দেখে মূর্ছা যেতে যেতেও নিজেকে সামলে নিয়েছে মিনতি। হঠাৎ বাৎসল্যের জোয়ার উজ্জীবিত করে তুলেছে চিরন্তন মাতৃহৃদয়কে। বুলাঙ্গিরের চাঁদার অত্যাচারের প্রতিবাদের চিহ্ন সারা শরীরে মেখে শুয়ে থাকা পুরুষটিকে স্নেহে ভালবাসায় সেবায় সারিয়ে তোলার ভাবনা সঞ্জীবনীর কাজ করেছে। প্রায় দুই মাস মনোহারি দোকান খুলতে পারেনি চন্দন। পঞ্চায়েতের বাবুদের কাছে একশো দিনের কাজের আর্জি নিয়ে গিয়েছে মিনতি। পঞ্চায়েত অফিসের গৌতম হাজরা বলেছে, ''বুলাঙ্গির ভাইয়ের কাছে যাও।'' পঞ্চায়েত অফিস থেকে বেরিয়ে মিনতি ঘৃণায় এক দলা থুথু ছুঁড়ে দিয়েছে রাস্তায়। বাড়ি ফিরে পরের দিন চন্দনকে ঠেলে পাঠিয়েছে দোকান খুলতে। দুই মাস পরে চন্দন হেমগঞ্জের বাজারে গিয়ে দেখেছে যে, তার দোকানটা আর তার নেই। শুনেছে, এই বাজার এখন 'বুলাঙ্গির বাজার' হয়ে গেছে। বাজারের মালিক বুলাঙ্গির। চন্দনের দোকানের মালিকানা বদল হয়ে গিয়েছে। সেই দোকান এখন 'আশরফ ইমিটেশন সেন্টার'। উলটোদিকের রঞ্জনের দোকানের দিকে তাকিয়ে চন্দন দেখল সেই দোকানেরও নাম বদলে হয়েছে, 'আলমগীর টেলিকম'। রঞ্জনের খোঁজ করার চেষ্টা করেনি চন্দন। পরাজিত সৈনিকের মতো মাথা নীচু করে কালু মিঞার চায়ের দোকানের সামনে দিয়ে ফেরার সময় কালু মিঞা ডেকেছে তাকে। বসিয়ে এক কাপ চা হাতে ধরিয়ে জর্দায় কালো হয়ে যাওয়া দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলেছে, ''যাও একবার বুলাঙ্গির ভাইয়ের কাছে। দয়া করে যদি বাজারের ওই প্রান্তটায় বসে দেয় তো দেখো।'' চায়ের পয়সা দিতে গেছে চন্দন। দেঁতো হাসি হেসে বারণ করেছে কালু।

মাটিতে মিশে যেতে যেতে বুলাঙ্গিরের কাছে গেছে চন্দন।

বুলাঙ্গিরের দেখা পায়নি। বুলাঙ্গিরের সঙ্গী নারায়ণ সরদার বলেছে, ''ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করব বললেই কি দেখা হয়? দুই দিন পরে আয়। দেখি যদি কিছু করা যায়।'' বাড়ি গিয়ে মিনতিকে কিছু বলতে পারেনি চন্দন। বলেছে, ''দোকান তো এতদিন বন্ধ। নতুন করে খোলা কী সহজ কথা। সময় লাগবে।'' পরের দিন সকাল বেলায় বেরিয়েছে বাড়ি থেকে। সারাদিন ঘাটের ধারে বসে থেকে সন্ধ্যায় শেষ খেয়ায় বাড়ি ফিরেছে। মিনতিকে আসল কথাটা বলতে পারেনি সাহস করে। দুই দিন পরে বুলাঙ্গিরের আড্ডায় আবার গেছে চন্দন। নারায়ণ সরদার বেজার মুখে বলেছে, ''বুলাঙ্গির ভাই নেই। যা বলার তার ভাই লাদেন ভাইকে বল।'' বুলাঙ্গিরের ছোট ভাই লাদেনের কাছে গিয়ে বাজারের এক প্রান্তে একটুখানি জায়গা চেয়েছে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে। লাদেন বলেছে, ''বুলাঙ্গির ভাইকে বলে দেখি। দুই দিন পরে আয়।'' দুই দিন পরে বুলাঙ্গিরের আড্ডায় যেতে নারায়ণ সর্দার বলেছে, 'ভাগ্য ভালো তোর। বুলাঙ্গির ভাই অনুমতি দিয়েছে। কোনো পাকা ঘর করতে পারবি না। প্লাস্টিক টাঙিয়ে বসবি। মাসে মাসে ৩০০ টাকা করে দিবি।''

চন্দন বেরিয়ে এসেছে বুলাঙ্গিরের আড্ডা থেকে। খুশি হবে, না দুঃখ করবে বুঝতে পারেনি। প্লাস্টিক টাঙিয়ে কী ব্যবসা করবে, আর করে মাসে ৩০০ টাকা চাঁদা দেবে সেই চিন্তায় ডুবে নৌকায় ভেসে কোনোক্রমে বাড়ি এসে পৌঁছেছে। আর লুকিয়ে রাখতে পারেনি মিনতির কাছে। মিনতি তার শেষ আশ্রয়। টলটলে চোখে শুকনো মুখে সব জানিয়েছে মিনতিকে।

সেই যে নোনাজল ঢুকে মরে গেছিল যে জমি, সেই জমি এখন বুলাঙ্গিরের দখলে। নদীর নোনাজল ঢুকিয়ে মাছ চাষ হয় সেখানে। চন্দনের মতো গ্রামের প্রায় সকলের জমি এখন বেদখল। বিশাল চাষের জমি এখন বাঁওড়ের মতো জলে টইটম্বুর। মাঠের ধারে মাঝে মাঝে ছোট ছোট চালাঘর। সেখানে রাতের বেলায় টিমটিম করে আলো জ্বলে প্রায়ই। সন্ধ্যার পরে গ্রামের পথে ভিন্ গাঁয়ের যুবতী মেয়েদের দেখতে পায় চন্দন। হাতে শাঁখা, সিঁথিতে সিঁদুর। সঙ্গে থাকে কখনো গৌতম হাজরা, কখনো নারায়ণ সরদার, কখনো-বা বুলাঙ্গিরের অন্য কোনো শাগরেদ। নিশুতিরাতের শেষ প্রহরে চাঁদের আলো যখন হলুদ হয়ে আসে তখন সেই পথ দিয়েই ফিরে যায় মেয়েগুলি। বিনিদ্র, নিস্তব্ধ রজনীতে সেই মেয়েদের হাতের শাঁখা-পলা-লোহার ঠোকাঠুকির রিনরিনে আওয়াজে দম বন্ধ হয়ে আসে চন্দনের। আড় চোখে তাকায় পাশে শোওয়া মিনতির দিকে। বুঝতে পারে মিনতিরও চোখে ঘুম নেই। মিনতি আবার ঘন হয়ে আসে চন্দনের। তার বাহুতে মাথা রেখে বুকে মুখ গুঁজে দেয়। চন্দন বোঝে সেই জ্যোৎস্নালোকিত রাতের মতো প্রেম নয়—একটা উৎকট, বীভৎস ভয়ে তাকে জড়িয়ে ধরছে মিনতি।

একদিন রাতে সেই বিভীষিকা মূর্তি ধরে। গভীর রাতে টোকা পড়ে চন্দন আর মিনতির দরজায়। দরজা খুলে চন্দন দেখে বুলাঙ্গিরের শাগরেদ হাসান দাঁড়িয়ে আছে দরজার বাইরে। প্রচণ্ড মদের গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসে চন্দনের। তার জড়ানো গলা থেকে যে শব্দগুলি বেরোয় সেগুলি চন্দনের কানে গরম সিসার মতো ঢোকে। ঘুমন্ত রজনীর গায়ের উপর সন্তর্পণে পাতলা চাদর টেনে দিয়ে মাথা নীচু করে নির্বাক স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে থাকা চন্দনের চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে যায় মিনতি।

শেষ রাতে বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে ছেঁড়া শাড়িতে নিজেকে জড়িয়ে ঘরে ঢোকে মিনতি। লুটিয়ে পড়তে যায় মেঝেতে। চন্দন ধরে ফেলে তাকে। শেষ রাতের ফিকে অন্ধকারে পুকুরে নিয়ে যায়। ভোরের আলো ফোটা পর্যন্ত পুকুরের জলে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে বসে থাকে মিনতি। সারা শরীর গামছা দিয়ে ঘসে ঘরে মুছে ফেলতে চায় ভেড়ির ধারের ঘরের আঁশটে গন্ধ ভরা ক্লেদ। পাখির ডাকে ঘোর ভাঙে। বুঝতে পারে, পুকুরের জলে জগতের সবথেকে দামি সাবান দিয়ে ধুলেও এই নারকীয় গন্ধ যাবে না। মড়ার মতো নিস্তেজ চোখে উঠে আসে পুকুর থেকে। সেই দৃষ্টিতে গভীর দীঘির মতো টলটলে জল নেই, রয়েছে মজা কুঁয়োর অতল অন্ধকার। ঘরে ফিরে চন্দন আর মিনতির চোখ যায় বিছানায়। নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে রজনী। মিনতির চোখে এবার নামে বাঁধভাঙা জল। নিজের দেহ মনের কষ্টকে ছাপিয়ে তার মনে উঁকি দেয়, রজনীর জীবনে ঘনিয়ে আসা অমাবস্যার রাতের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের ভয়াল বিভীষিকা।

চুপিসাড়ে দুই দিন পরে সন্ধ্যার শেষ খেয়া ধরে চন্দন আর মিনতি বেরিয়ে পড়ে দুটি পোঁটলায় সংসার বেঁধে। সঙ্গে মেয়ে রজনী। তাদের কোনো ঠিকানা নেই। চতুর্দিকের গভীর অন্ধকারের মধ্যে কোনোক্রমে হাতড়ে হাতড়ে চলে। মেয়েটিকে নরকের দরজা থেকে কিছুটা দূরে নিয়ে যেতে চায় মিনতি।

এক পক্ষ কেটেছে। অজানা, অচেনা শহরে পূতিগন্ধময় বস্তির এক কোণে চার দেওয়ালের মধ্যে সংসার পেতেছে তারা নতুন করে। এই শহরের ভাষা জানে না মিনতি, জানে না এখানকার রীতিনীতি। এখানকার বাজারে ঝিঙে পটোল দেখতে পায় না সে। শুধু জানে, তারই বিশাল দেশের সুদূর দক্ষিণে সাগরের ধারে কোনো এক শহর এটি। চন্দন এখানে মজুরি খাটে সারাদিন। দিনশেষে ক্লান্ত শরীরে বাড়ি ফেরে। তার চোখে নিরাশার অন্ধকার দেখতে পায় মিনতি। তার হৃদয়ে বাৎসল্যের জোয়ার আসে। গভীর মমতায় নিজের বুকের মধ্যে চন্দনের মাথাটা জড়িয়ে ধরে। নীরব চোখের জলে মিনতির বুক ভিজে যায়।

একদিন চন্দন শোনে মিনতির গর্ভে নতুন সন্তান এসেছে। খুশি হবে, না দুঃখ করবে বুঝতে পারেনি চন্দন। তার স্তম্ভিত মুখের দিকে তাকিয়ে পাথরের মতো কঠিন, বরফের থেকেও শীতল গলায় মিনতি বলেছে, ''ডাক্তারের খোঁজ নাও। এই পাপের বীজ আমি রাখব না।''

হাসপাতালে গিয়ে পাপের ফসল খসিয়ে এসেছে মিনতি। নিজের পবিত্র মাতৃগর্ভে পাপকে বাড়তে দেবে না সে। বাৎসল্যময়ী মাতৃহৃদয় যে গর্ভপাত করে আনন্দে বিভোর হয়ে উঠতে পারে— সেই সত্য তার জানা ছিল না। এ তার নতুন আবিষ্কার। বহুদিন পরে রাতের আঁধারে এঁদো নর্দমার গন্ধ ভরা ঘরের মধ্যে চন্দনের দিকে ঘন হয়ে আসে মিনতি। তার কঠিন বাহুতে মাথা রেখে মুখ গুঁজে দেয় বুকে—এবার আর ভয়ে নয়, অনাবিল প্রেমের নির্ভরতায়। □